আমাদের শিক্ষা।



শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

কমলা বুকডিপো, লিমিটেড্।

কলিকাতা, বাঁকীপুর।

১৯৩২।

॥৵০

প্রকাশক—

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, এম্‌-এ, বার-য়্যাট-ল।

৩, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রিণ্টার :—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দে,

মেট্‌কাফ্ প্রেস,

৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ভূমিকা।

—※—

যে সাতটি প্রবন্ধ একত্র করে ছাপাচ্ছি, তার প্রথমটি বাদে বাকী কটি সবই ফরমায়েসি লেখা অর্থাৎ পরের অনুরোধে লেখা।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এ তিনটি প্রবন্ধ তিনটি বিভিন্ন সভায় বিভিন্ন সময়ে উক্ত। অতএব এ কটির ভিতর একটা স্পষ্ট ধারাবাহিকতা নেই। কিন্তু এখন পড়ে দেখছি যে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মূল মতগুলি এই কটি লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে আমি দেশের লোককে এই কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে মাতৃভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন না হলে আমরা যথার্থ শিক্ষিত হব না।

তৃতীয় প্রবন্ধে আমার বক্তব্য এই যে ইংরাজিতে যাকে বলে Culture আর সংস্কৃতে বৈদগ্ধ্য, সেটি হচ্ছে সভ্যতার একটি উচ্চাঙ্গ এবং এ অঙ্গ পুষ্ট করবার প্রধান উপায় সাহিত্য চর্চ্চা।

চতুর্থ প্রবন্ধে আমি দুটি জিনিষের প্রতি আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রয়াস পেয়েছি। আমার প্রথম কথা এই যে, স্কুলের শিক্ষা কাঁচা হলে কলেজের শিক্ষা ব্যর্থ হয়। সুতরাং স্কুলের শিক্ষার যাতে উন্নতি হয় সেই বিষয়ে প্রধানত সকলের উদ্যোগী হতে হবে। আমার দ্বিতীয় কথা এই যে, যে শিক্ষার বলে মানুষে কৃতী বৈশ্য হয় একমাত্র সে শিক্ষা আমাদের মধ্যে চল্‌বে না এবং যদি চলে তার ফলও ভাল হবে না। বাঙালীজাতির মনে যে সহজ ব্রাহ্মণবুদ্ধি আছে সেটিকে নষ্ট করা আর বাঙালীর বিশেষত্বকে নষ্ট করা একই কথা।

এ প্রবন্ধ কটি ইউনিভারসিটি কমিসনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পূর্ব্বে লিখিত, প্রথম তিনটি বহুদিন পূর্ব্বে এবং চতুর্থটি অব্যবহিত পূর্ব্বে। আমার মত আমি পুনঃপ্রকাশিত করতে সাহসী হচ্ছি এই কারণে—যে উক্ত কমিসনের নিকট এ সকল মতই গ্রাহ্য হয়েছে।

নববিদ্যালয় সম্বন্ধে- তিনটি মাত্র প্রবন্ধ লিখে থামবার কারণ—তারপর যে সব বিষয়ের আলোচনা করতে হত, সে সব শিক্ষক ব্যতীত অপব কারও পক্ষে তেমন মনোজ্ঞ হত না।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

আমাদের শিক্ষা।



স্পর্শ করলে দেহের যে অঙ্গ একেবারে সাড়া দেয় না, সে অঙ্গ মৃত—আর যে অঙ্গ অতিরিক্ত সাড়া দেয়—সে অঙ্গ রুগ্ন।

আমাদের ব্যবহারে মনে হয় যে, ব্যথা আমাদের সকল গায়ে ;—কেননা কেউ আমাদের গায়ে হাত দিলে, আমরা অসঙ্গত ভাবে চীৎকার করে উঠি—অসম্ভব রকম ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি। শুধু তাই নয়, দেখতে পাই অনেকের ধারণা যে সহ্যগুণটা মেয়েলি-ধর্ম্ম এবং চীৎকার করাতেই পুরুষ মানুষে পৌরুষের—পরিচয় দেয়।

আমাদের সব চাইতে বেশী ব্যথা লাগে, যদি কেউ আমাদের অহঙ্কারে আঘাত করে,—তার কারণ আমরা জাৎকে জাৎ রাতারাতি বেজায় অহঙ্কারী হয়ে উঠেছি। আমাদের বিশ্বাস যে বর্ত্তমান যুগে আমরা ভারতবর্ষের সর্ব্বাগ্রগণ্য জাতি। এ দাবীর মূলে আছে আমাদের শিক্ষা। মাথা-গুণতি হিসেবে বাঙ্গালী যে সব চাইতে উচ্চ-শিক্ষিত, তার প্রমাণ বোধহয় সেন্‌সাস্‌-রিপোর্ট থেকেই পাওয়া যায়। তারপর এ যুগের নবশিক্ষা আমাদের জাতীয়-দেহে যে কতকটা নবজীবন এনে দিয়েছে, আমাদের মনে যে ইউরোপীয় সভ্যতার রং একটু বেশী করে ধরেছে—এ সত্যও প্রত্যক্ষ। সুতরাং আমাদের শিক্ষার কেউ নিন্দা করলে, অমনি আমাদের গাত্রজ্বালা উপস্থিত হয়। এবং প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির কেউ বদল করতে চাইলে আমরা মনে মনে প্রমাদ গণি।

সম্প্রতি এ দেশের ইংরাজি-কাগজওয়ালারা আমাদের শিক্ষার উপর কলমের খোঁচা দিতে সুরু করেছেন অমনি আমরা অস্থির হয়ে উঠেছি। আমি পূর্ব্বেই বলেছি খোঁচা খেয়ে খিঁচুনিটে দেহমনের স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। পরনিন্দা

পরখ করে দেখলে, দেখতে পাওয়া যায় যে, তা প্রায়ই নেহাৎ বাজারে মাল, অর্থাৎ তা যেমন সস্তা তেমনি খেলো।

সে যাই হোক আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে মনে রাখতে হবে যে, আমাদের কপালে লোকে-লোক-লাঞ্ছনা ও ঘরে গুরুগঞ্জনা দুই লেখা আছে। এই ডাইনে বাঁয়ে আক্রমণের ভিতর দিয়ে—আমাদের জাতীয় জীবনের নূতন পথ কেটে বেরিয়ে যেতে হবে। সে শক্তি যদি আমাদের না থাকে ত আমরা যথার্থ শিক্ষিত নই। কেননা যে জ্ঞান বিজ্ঞান মানুষের আত্মশক্তিকে প্রবুদ্ধ না করে, তা শুধু বিদ্যার পাপের বোঝা। আর তা ছাড়া আমরা আজকাল যে নিন্দার ভাগী হয়ে পড়েছি, তার ওজন যতই বেশী হোক্; তার মূল্য যাচাই-সাপেক্ষ।

আমাদের শিক্ষার উপর একদল ইংরাজ এই কারণে নারাজ যে তার ফলে আমরা এ দেশের প্রচলিত রাষ্ট্রতন্ত্রের বদল চাই; আর আমাদের গুরুজনদের মধ্যে একদল এই কারণে নারাজ যে, আমরা এ দেশের প্রচলিত সমাজ-তন্ত্রের বদল চাই। এঁরা উভয়েই চান যে আমরা শিক্ষা পাব নতুন, কিন্তু আমাদের মন থেকে যাবে সনাতন। এক কথায় এঁরা চান যে বাঙ্গালী তার মনের আবাদ করবে, কিন্তু তাতে কোনও ফসল ফলবে না। শিক্ষার এ রকম যদি কোনও আদর্শ-পদ্ধতি থাকে ত মানব-সমাজ আজ পর্য্যন্ত তা আবিষ্কার করতে পারে নি। আর যদি কস্মিন্‌কালে পারে ত বাঙ্গালাদেশে তা বিশেষ কাজে লাগবে না; কেননা বাঙ্গালীর দেশের মত বাঙ্গালীর মনও মরুভূমি নয়; সুতরাং এ ক্ষেত্রে যে ভাবের বীজ বোনা যাবে, তা উপ্ত ও অঙ্কুরিত হতে বাধ্য। সে আমাদের মাটির গুণে—বিলেতি লাঙ্গলের দোষে নয়।

সুতরাং সমালোচকদের খোঁচাখুঁচিতে অধীর হয়ে পড়বার বিশেষ কোনও কারণ নেই—তবুও যে আমরা চঞ্চল হয়ে উঠি—তার থেকে কি এই প্রমাণ হয় না যে আমাদের উচ্চশিক্ষাভিমানের ভিৎ এখনও তেমন পাকা হয় নি এবং সেইজন্য তার উপর কেউ হস্তক্ষেপ করলে আমরা অযথা রকম ভয় খাই?

আমার মতে কিন্তু আমাদের গায়ে যে খোঁচা মারে, সেইআমাদের পরম সুহৃদ। খোঁচার ধর্ম্ম হচ্ছে মানুষকে সজাগ করে দেওয়া এবং এখন আমাদের ঘুমের অবসর নেই,—যে করেই হোক এ যুগে আমাদের হৃদয় মনকে জাগিয়ে রাখতেই হবে। আর যদি জাতীয চৈতন্যকে জাগরূক করবার শক্তি আমাদের ভিতরে না থাকে ত বাইরের ধাক্কা আমাদের পক্ষে আদরের সামগ্রী হওয়া উচিত।

আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে পরনিন্দা যে আমাদের গায়ে সয় না—তার কারণ ও বস্তুতে আমরা নিজেই সন্তুষ্ট নই; এবং সন্তুষ্ট হবার কোন কারণও নেই। শুধু আমরা কেন, পৃথিবীর অনেক জাতই—স্বদেশের শিক্ষাপদ্ধতির উপর বিরক্ত—এবং সে বিরক্তির কারণ পৃথিবীতে আদর্শ শিক্ষা বলে কোনও বস্তু নেই, এবং থাকতে পারে না। শিক্ষা নিয়ে মানুষ আজ পর্য্যন্ত শুধু Experiment করছে এবং কাজে কাজেই Experience-এর ফলে—শিক্ষাপদ্ধতির নিত্য নতুন পরিবর্ত্তন হতে বাধ্য। শিক্ষার যে একটা আদর্শ পদ্ধতি হতে পারে, এ অমূলক ধারণা আছে শুধু অশিক্ষিত জনসাধারণের এবং প্রচলিত শিক্ষাই যে আদর্শ শিক্ষা এ অদ্ভুত বিশ্বাস আছে শিক্ষিত জনসাধারণের।

শিক্ষা নিয়ে মানুষে চিরকাল শুধু Experiment করে আসছে, এ কথা সত্য হলেও পৃথিবীর অপর সব দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের এ বিষয়ে একটা প্রকাণ্ড প্রভেদ আছে।

ইউরোপের সকল দেশের শিক্ষাপদ্ধতিই জাতীয় জীবনের সঙ্গে সঙ্গে কালক্রমে গড়ে উঠেছে—অবশ্য সমভাবে নয়। সে দেশের মামুলি শিক্ষা কখনও বা জাতীয় জীবনের গতির সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারে নি, এবং সেই কারণে তা নবযুগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, আবার কখনও বা সে শিক্ষা জাতীয় জীবনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে এবং সমাজকে নবমন্ত্রে শিক্ষিত করে জাতীয়-জীবনের নবতন্ত্র সৃষ্টি করেছে। গত একশ বৎসরের ইউরোপের ইতিহাস এই সত্যের পরিচয় দেয় যে ইংলণ্ডের শিক্ষার ধাৎ হচ্ছে জীবনের

পশ্চাৎপদ থাকা আর জার্ম্মাণির অগ্রসর হওয়া। কিন্তু ধীরেই হো'ক আর দ্রুতবেগেই হোক—ইউরোপের সকল দেশেই শিক্ষার পদ্ধতি জাতীয় জীবনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্ত্তিত হয়ে আসছে; কারণ সে দেশের লোকেরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন, যে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। কখন বা নবশিক্ষা নবযুগের বোধন করে, কখন বা নবযুগ নবশিক্ষার আবাহন করে, এই যা তফাৎ।

অপর পক্ষে আমাদের নবশিক্ষা আমাদের জাতীয় বুদ্ধি কিম্বা জাতীয় নির্ব্বুদ্ধিতা থেকে জন্মলাভ করেনি। একালের স্কুল কলেজ দেশের মাটিতে গজায় নি, আকাশ থেকে পড়েছে—সুতরাং এ বস্তু আমরা এখনও ভাল করে চিনিনে; সুতরাং এর ফলাফল সম্বন্ধে পাঁচ-জনের সন্দিহান হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক।—শুধু তাই নয়, এই শিক্ষা দেশের মাটিতে শিকড় গাড়বে কি না, সে বিষয়েও অনেকের সন্দেহ আছে। কেননা তা মূলত বিদেশী। এ সন্দেহ অবশ্য একেবারে অকারণ। যে শিক্ষার বলে নব-ইউরোপের বুদ্ধি ও চরিত্র গড়ে উঠেছে, তা আদিতে সম্পূর্ণ বিদেশী ছিল। গ্রীক্ ল্যাটিন সাহিত্যের ও খৃষ্ট ধর্ম্মের অজ্ঞতায়—ইউরোপীয় সভ্যতা যে কি রূপ ধারণ কর্‌ত, তা আমরা কল্পনাও কর্‌তে পারি নে;—সম্ভবতঃ ইউরোপীয়েরাও পারেন না। পরস্পরের জ্ঞানের ও ভাবনার আদান প্রদান থেকেই বিশ্ব-মানবের মনের সাম্রাজ্য যুগপৎ স্থিতি ও বিস্তৃতি লাভ কর্‌ছে। মনোজগতে যে জাতি একঘরে সে জাতি পতিত।

আমাদের জীবনের সঙ্গে আমাদের নবশিক্ষা যে আজও সম্পূর্ণ খাপ খায় নি—তার কারণ, তা অতি নূতন। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ত সে দিন হয়েছে। আমাদের এ স্বল্পায়ুঃ জাতের মধ্যে এমন লোক বোধ হয় আজও আছেন—যাঁরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাত-কর্ম্মের সময় উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং আমরা যে এই নবশিক্ষাকে একেবারে আপনার করে নিতে পারি নি, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। Oxford, Cambridge, Paris,

Bologna প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়েস প্রায় হাজার বৎসরের কাছাকাছি—আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সবে ষাট পেরিয়েছে; সুতরাং ইউরোপে শিক্ষা নিয়ে আজও যদি ezperiment চলে—তবে আমাদেরও যে তা চল্‌বে তাতে আর আটক কি? সত্য কথা এই যে, আমাদের এই শিক্ষা প্রথমতঃ বিদেশী, দ্বিতীয়তঃ নূতন; সুতরাং এর মতিগতি ফেরাবার, এর রীতিনীতি পরিবর্ত্তনের যথেষ্ট অবসর আছে। আশা করি, এ ধারণা কেউ মনে পোষণ করেন না যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একপুরুষে এত বনেদি বড়মানুষ হয়ে উঠেছে—যে তার হালচাল আর বদলানো যাবে না। আমাদের শিক্ষার এই অর্ব্বাচীন পদ্ধতি যাতে দেখতে দেখতে চোখের সুমুখে প্রাচীন না হ'য়ে ওঠে, নূতন যাতে সনাতন না হয়, তার জন্য এর প্রতি আমাদের জাতীয় মন নিয়োগ করতে হবে, শিক্ষা সম্বন্ধে public opinion-এর সৃষ্টি করতে হবে, জাতীয় শিক্ষা জাতীয় বিচারবুদ্ধির অধীন করতে হবে। যে নিন্দা প্রশংসার ভিতর বিচার নেই, বিবেচনা নেই,—তা অবশ্য একটা উপদ্রব বিশেষ। এবং অনেকের বিশ্বাস যে ইংরাজিতে যাকে বলে public opinion তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজ্ঞতাপ্রসূত—সুতরাং ও বস্তুর রাজনীতিতে যে সার্থকতাই থাক, শিক্ষানীতিতে কোনই সার্থকতা নেই। যেখানে বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে কারবার, সেখানে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছাড়া অপর লোকের মত প্রকাশ করবার কোনও অধিকার নেই—কেননা, সে মতের কোনও মুল্য নেই। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। দেশে দেশে, যুগে যুগে, মানুষে মানুষে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে এতটা মতভেদের পরিচয় দেয় যে বোধ হয়, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও পৃথিবীতে ততটা মতভেদ নেই। শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় করবার পক্ষে publie opinion-এর যথেষ্ট সার্থকতা আছে কেননা জাতীয় জীবনের আদর্শ কেবল মাত্র পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্যে স্থির করা যায় না,—সে আদর্শ জাতীয় আশা ভরসা দিয়েই গড়া এবং কোনও বিশেষ দেশের কোনও বিশেষ যুগের সামাজিক আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার গুণেই জাতীয় মতিগতির লক্ষ্য নূতন হয়। বিদ্যালয়ের

উদ্দেশ্য শিক্ষাদান করা, আর সমাজের অভিপ্রায় তার ফলভোগ করা—সুতরাং এ উভয়ের সম্পর্ক আপেক্ষিক ও ঘনিষ্ঠ। বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু। আর এর প্রমাণ সকল দেশেই পাওয়া যায় যে শিক্ষা দেওয়া যাঁদের ব্যবসা তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোক শিক্ষার পদ্ধতির উপর এতটা নজর দেন, যে শিক্ষার উদ্দেশ্যের কথাটা তাঁরা প্রায়ই ভুলে যান। বিদ্যালয় নামক যন্ত্রটার কলকব্জায় তেল দেওয়াটাই তাঁদের কাছে হয়ে ওঠে গুরুতর কর্ত্তব্য। সুতরাং বিদ্যালয়বস্তুটি যে সমাজ-দেহের একটি বিশেষ অঙ্গ, সে বিষয়ে গুরুমহাশয়দের সদাসর্ব্বদা সতর্ক করে রাখবার জন্য তাঁদের মনের উপর বারোমাস public opinion-এর চাপ রাখা আবশ্যক। নচেৎ এমন দিন আসে, যখন সমাজ হঠাৎ আবিষ্কার করে যে শিক্ষা জিনিসটে জীবন-যাত্রার সহায় হওয়া দূরে থাক, তার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখন প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে public opinion একটা হুজুগে পরিণত হয়। বাইরের একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় সামাজিক মন যখন চম্‌কে উঠে চোখ মেলে, সব ঝাপসা দেখে, তখন শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তনের জন্য তার আর ত্বর সয় না। ফলে সকলে মিলে শিক্ষার উন্নতি সাধন কর্‌তে গিয়ে অনেক সময়ে তার বিভ্রাট ঘটায়। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে সামাজিক মনকে শিক্ষা সম্বন্ধে অহর্নিশ সচেতন করে রাখা যে জাতির পক্ষে কল্যাণকর সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই এবং তার জন্য চাই public opinion অর্থাৎ দু'এক জনের সেই মত যা দশজনে নিজের বলে গ্রাহ্য করে নেবে। আমাদের দেশে আজকের দিনে প্রচলিত শিক্ষা সম্বন্ধে কোনরূপ সঙ্গত public opinion নেই। কিন্তু তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট এবং কতকাংশে অযথা অসন্তোষ আছে।

এক দলের মতে এ শিক্ষায় শুধু কুফল ফল্‌ছে। কিন্তু কুফলটা যে কি সে বিষয়ে এঁরা সকলে একমত নন্; কেননা, সে সম্বন্ধে তাঁদের কারও কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। এঁদের কথাবার্ত্তা শুনে মনে হয় যে শিক্ষার কোনরূপ ফল ফলাটাই এঁদের মতে দোষ; কেননা সে ফল নতুন। নব-

শিক্ষার প্রভাবে মানুষের মনে যে নূতন ভাবের সৃষ্টি হবে, এ ত ধরা কথা। সুতরাং এই নূতনত্বটাই যদি দোষের হয়; তাহলে, শিক্ষার পাট উঠিয়ে দেওয়াই কর্ত্তব্য। স্কুল কলেজের দুয়োরে চাবি দেওয়াটা অবশ্য শিক্ষার পথ পরিষ্কার করা নয়। এঁরা তাই স্কুল কলেজ একেবারে বন্ধ করবার পক্ষপাতী নন। এঁরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর ফটক বন্ধ করে খিড়কির দরজা খুলে রাখা হোক্; কেননা আজকাল সেখানে যত লোক ঢোকে তত বেরোয় না এবং যত লোক বেয়োয়, তত বেরোনো উচিত নয়। বিদ্যার্থীর সংখ্যা কমিয়ে দেওয়াটা যাঁরা শিক্ষা বিস্তারের সদুপায় মনে করেন, তাঁদের কথার কি জবাব দেওয়া যাবে ভেবে পাওয়া যায় না। সুতরাং এ শ্রেণীর সমালোচকদের কলরব শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েই উপেক্ষা করতে বাধ্য। এদের ধারণা যে শিক্ষার উন্নতি সাধনের একমাত্র উপায় হচ্ছে তার বিস্তৃতি কমিয়ে আনা। উচ্চশিক্ষা লাভ করবার শক্তি যে সকলের নেই—এ কথা সত্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বহুলোককে সুযোগ না দিলে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের আশা করা যায় না। এঁরা ভুলে যান যে, যথার্থ শিক্ষিত ব্যক্তি স্বশিক্ষিত; স্কুল কলেজ শুধু মানুষকে নিজগুণে নিজ চেষ্টায় শিক্ষিত হয়ে ওঠবার সুযোগ দেয় এবং সাহায্য করে—এর বেশী আর কিছু নয়। যে জাতি এই সুযোগ যত বেশী পায়, সে জাতি তত বেশী সুশিক্ষিত।

অনেকের মতে আবার এ শিক্ষা অচল, কেননা তা নিস্ফল। এঁরা বেশ স্পষ্ট দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। এঁদের এক দলের মতে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা যথেষ্ট অর্থকরী নয়। এরা চান—বিশ্ববিদ্যালয়কে বৈশ্য বিদ্যালয়ে পরিণত করতে। এ শ্রেণীর লোক শুধু ভারতবর্ষে নয় সকল দেশেই আছে। এঁদের আর এক দলের মত ঠিক এর বিপরীত—এঁদের বুলি হচ্ছে Knowledge for knowledge's sake—অর্থাৎ এঁদের আদর্শ হচ্ছে সেই বিশ্ববিদ্যালয় যার শিক্ষার প্রসাদে মানুষ বৈশ্য নয় নিঃস্ব হবে। বলা বাহুল্য এ দুই মত সমান সত্য হতে পারে না; কেননা এদের পরস্পরের মনের ভিতর আকাশ পাতাল

প্রভেদ আছে। এ দুয়ের ভিতর যদি একটি গ্রাহ্য করতে হয়, তাহলে আমরা বরং শেষোক্ত মতে সায় দেব। কেননা, মনকে ঘুম পাড়িয়ে দেহকে কর্ম্মক্ষম করা আর যে দেশেরই আদর্শ হোক ভারতবর্ষের হতে পারে না। আমরা যে প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী, সে সভ্যতার যদি কিছু মাহাত্ম্য থাকে ত সে এই গুণে যে, তার কাছে বাইরের চাইতে ভিতরের মূল্য ঢের বেশী ছিল। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে, এ উভয় সঙ্কট আসলে কাল্পনিক। এঁরা উভয়েই নিতান্ত একদেশদর্শী। সমাজ নিষ্কর্ম্মা জ্ঞানীও চায় না—অজ্ঞ কর্ম্মীও চায় না। সমাজ চায় যে সমাজিক মানব একাধারে জ্ঞানী ও কর্ম্মী হবে। এবং সেই হচ্ছে আদর্শ বিদ্যালয়—যা মানুষকে একসঙ্গে কিছু হতে এবং কিছু করতে শেখাবে। এই সোজা কথাটা মানুষকে বারবার শোনানো দরকার—কেননা, আমরা হয় সাংসারিক নয় মানসিক অভ্যুদয়ের লোভে দিনে দশবার তা ভুলে যাই। সুতরাং জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গের সমালোচকদের কথা সম্পূর্ণ গ্রাহ্য না হলেও সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় নয়, কেননা এঁদের দুজনের কথার ভিতর আংশিক সত্য আছে।

কিন্তু আমরা—যারা নবশিক্ষাকে বিফল বলে অবজ্ঞা করিনে এবং তাতে কুফল ফলছে বলে ভয় করি নে—আমরাই কি এ শিক্ষায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট? অবশ্য না। তার কারণ, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর আশানুরূপ সুফল ফলছে না। এই ত্রুটির কারণ কি সে বিষয়ে আমাদের আর উদাসীন হয়ে থাকা চলবে না; সুতরাং আমি দেশশুদ্ধ লোককে আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে একটু মনোযোগ দিতে অনুরোধ করি, যাতে করে আমরা এ বিষয়ে একটা সঙ্গত public opinion খাড়া করতে পারি। ইউরোপের সমস্যা হচ্ছে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগ রক্ষা করা এবং আমাদের হচ্ছে এ উভয়ের যোগসাধন করা।

ফাল্গুন ১৩২৩ শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বাংলার ভবিষ্যৎ।

(মির্জ্জাপুর ফিনিক্স ইউনিয়ন লাইব্রেরিতে পঠিত)

বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রথম বঙ্গদর্শন প্রকাশ করেন, তখন তিনি বাঙ্গালীর পক্ষে বাংলা লেখার ঔচিত্য এবং সার্থকতা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করতে বাধ্য হন। বঙ্গদর্শনের "পত্রসূচনা" বঙ্গসরস্বতীর তরফ থেকে একাধারে আরজি, জবাব ও সওয়াল-জবাব। বাংলা লেখার জন্য, বাঙ্গালীর পক্ষে স্বদেশী শিক্ষিত সমাজের নিকট কোনরূপ কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন যে একদিন ছিল, এ ব্যাপার আজকের দিনে আমাদের কাছে বড়ই অদ্ভুত ঠেকে।

—"যতদিন না শিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাংলা ভাষায় আপন উক্তি-সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোনও সম্ভাবনা নাই"—

বঙ্কিমের এ উক্তির সত্যতা যে যুক্তিতর্কের অপেক্ষা রাখে, এ আমাদের ধারণার বহির্ভূত, কেননা এ সত্য আমাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে না উঠলেও স্বীকার্য্য হয়েছে; কিন্তু বঙ্কিম যে সময়ে লেখনী ধারণ করেন, সে সময়ে এ সত্যকে মেনে নেওয়া দূরে থাক, কেউ ধরে নিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। সে যুগে ছিল ইংরাজির রেওয়াজ এবং ইংরাজিরই প্রতিপত্তি। সেকালের শিক্ষিত সম্প্রদায়—অর্থাৎ ইংরাজি শিক্ষিত সম্প্রদায়, ইংরাজি লিখতেন, ইংরাজি ছাড়া আর কিছু লিখতেনও না, এবং সম্ভবত কথাবার্ত্তাও কইতেন ঐ রাজ-ভাষাতেই। নতুবা বঙ্কিমের এ কথা বলবার কোনই আবশ্যকতা ছিল না যে,—

"ইংরাজি-লেখক, ইংরাজি-বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই।"

(২)

এ খুব বেশী দিনের কথা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এ লেখার তারিখ হচ্ছে পয়লা

বৈশাখ, ১২৭৯ সাল। জাতীয় জীবনের হিসাবে, পঁয়তাল্লিশ বৎসর অতি স্বল্পকাল, কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যেই বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে মাতৃভাষা সম্বন্ধে একটা বিশেষ ভাবান্তর ঘটেছে, বাংলা ভাষার প্রতি অভক্তি স্পষ্ট অতিভক্তিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের মধ্যে বাংলা লেখার প্রবৃত্তি বর্ত্তমানে যে কতটা অদম্য হয়ে উঠেছে, তার পরিচয় আমাদের মাসিক সাহিত্যেই পাওয়া যায়। যে দেশে পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, একখানি মাসিক পত্র বার করতে হলে বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় অসাধারণ লেখকেরও জবাবদিহি ছিল, সেই দেশে আজকের দিনে নিত্য নূতন মাসিক পত্রের জন্ম ও মৃত্যু হচ্ছে, অথচ তার জন্য আমাদের সাধারণ লেখকদেরও কারও কাছে কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। এই কলিকাতা সহর থেকে মাসে মাসে কত কাগজের যে আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, তারই সংখ্যা নির্ণয় করা অসাধ্য, কেননা এ ক্ষেত্রে জন্মমৃত্যুর কোনও সঠিক রেজিষ্টারি রাখা হয় না। যদিচ এখন কাগজের আকাল পড়েছে—তথাপি বাজারে নূতন কাগজের কোনও অভাব নেই। তারপর বাংলার পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের নানা নগরী ও উপনগরী থেকে, নানা আকারের নানা বর্ণের নানা পত্র পরস্পর রেষারেষি করে' শূন্যমার্গে উড্ডীন হয়ে সাহিত্য-গগনের শোভা বৃদ্ধি করছে! বঙ্গসরস্বতীকে ঢাকা দান করেছে "প্রতিভা", মৈমনসিং "সৌরভ", বহরমপুর "উপাসনা", এবং কুচবেহার "পরিচারিকা"। এক কথায়, এ বিষয়ে অনুষ্ঠানের ত্রুটি বাংলা-দেশের কোন অঞ্চলেই দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, নব-বঙ্গসাহিত্য বঙ্গ-দেশের সীমা অতিক্রম করে অঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশেও স্বীয় প্রসার লাভ ও প্রভাব বিস্তার করছে। তা ছাড়া এমন কথাও শুনতে পাই যে, গুজরাটী মারাঠী হিন্দী প্রভৃতি হাল সাহিত্যের প্রধান সম্বল হচ্ছে বাংলা বইয়ের ভাষায় অনুবাদ।

(৩)

এক হিসেবে এটি একটি আশ্চর্য্য ঘটনা, কেননা এ যুগে এদেশে ইংরাজির

চর্চ্চা কমা দূরে থাক্, এতটা বেড়ে গিয়েছে যে, ইংরাজি ভাষাকে এখন বাঙ্গালীর দ্বি-মাতৃভাষা বলা যেতে পারে, যদি না বৈয়াকরণেরা মাতৃ-শব্দের ঐরূপ দ্বিত্বে আপত্তি করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে, ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালী হাতে গোণা যেত, আর আজকের দিনে তাঁদের সংখ্যার সন্ধান নিতে হলে, সরকার বাহাদুরের আদমসুমারির খাতার অনেক পাতা ওল্টাতে হয়। সেকালের শিক্ষিত সম্প্রদায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় যাকে বলে "ইংরাজি-বাচক", তাই ছিলেন কিনা জানি নে, কিন্তু এ কথা আমরা সবাই জানি যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এদেশে এক নব সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়, যে সম্প্রদায় বাংলা কথা ভুলেও মুখে আনতেন না,—এমন কি ঘরেও নয়। সেই ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায়ের লোকেরাও যে আজ বাংলা বলেন, বাংলা লেখেন, এমন কি প্রকাশ্য সভাসমিতে খাঁটি বাংলায় বক্তৃতা পর্য্যন্ত কর্তে পিছ-পাও হন না, তার পরিচয় লাভ করবার জন্য আপনাদের অন্যত্র যেতে হবে না। আমার এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর চক্ষুকর্ণের বিবাদ ঘটবার কোনই সম্ভাবনা নেই।

বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে এ সব অবশ্য খুবই শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু আমাদের সাহিত্যের দেহপুষ্টির এই সব প্রত্যক্ষ লক্ষণ দেখে যদি কেউ মনে করেন যে, "বাংলা বনাম ইংরাজি" এই ভাষার মামলায় বাদীর পক্ষে পুরোপুরি জয়লাভ হয়েছে—তাহলে তিনি নিতান্তই ভুল করবেন; যা হয়েছে তা হচ্ছে তরমিম্ ডিক্রী। ওদিকে একটু দৃষ্টিপাত কর্লে সকলেই দেখতে পাবেন যে, আমাদের আইন আদালত, স্কুল কলেজ, রাজদরবার রাজনীতি, জ্ঞান বিজ্ঞান, সবই অদ্যাবধি ইংরাজির পুরো দখলে রয়েছে; শুধু তাই নয়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ গণ্যমান্য লোকেরা এ সকল ক্ষেত্রে ইংরাজির দখল বজায় রাখাই সঙ্গত ও কর্ত্তব্য মনে করেন। মাতৃভাষা ইংরাজির হাত থেকে সেইটুকু মাত্র ছাড়া পেয়েছে, যেটুকু তার পক্ষে কেঁদে বাঁচবার জন্য দরকার।

এইই যথেষ্ট প্রমাণ যে, বঙ্গ-সাহিত্যের যে বড়দিন এসেছে, সে দিনে বাংলা

ভাষা শিক্ষিত সমাজে অবজ্ঞার পাত্র না হলেও, শ্রদ্ধাভাজন হয়ে ওঠে নি। পূর্ব্বে মাতৃভাষাকে শিক্ষিত সম্প্রদায় যে যথেষ্ট অবজ্ঞা কর্‌তেন, তার প্রমাণ, তাঁরা অনেকেই বাংলা লিখতেন না; আর আজ যে সেই সম্প্রদায় সে ভাষাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন না, তার প্রমাণ, তাঁরা প্রায় সকলেই বাংলা লেখেন। "প্রবৃত্তিরেষা নরাণাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"—এ শাস্ত্র-বচন যে লেখা সম্বন্ধেও খাটে, এ জ্ঞান সকলের থাকলে, অনেকে বঙ্গ-সাহিত্য রচনা কর্‌তে প্রবৃত্ত হতেন না। আমি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার কর্‌তে বাধ্য হচ্ছি যে, এঁদের অনেকের গান ও গল্প পড়ে আমার মনে হয়, বাংলা লেখাটা এঁদের পক্ষে একটা সখ মাত্র, অবসরবিনোদনের একটি বিশিষ্ট উপায়—ভাষায় যাকে বলে বিশুদ্ধ আমোদ। কিন্তু সকলেরি মনে রাখা উচিত যে, যা অবকাশরঞ্জনী, তা কাব্য নয়—এবং যা অবসরচিন্তা, তা দর্শন নয়। ঐ ধ্যান ঐ জ্ঞান না করলে সাহিত্যের যথার্থ চর্চ্চা করা হয় না। লক্ষ্মীর সেবার অবসরে সরস্বতীর সেবা করা যে কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই,—তবে প্রশ্ন হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিটি কি? আমার মতে বেশীর ভাগ কাজের লোকেরা নিজে না লিখে, পরের লেখা পড়েই ছুটির যথেষ্ট সদ্ব্যবহার কর্‌তে পারেন। জ্ঞানকর্ম্মের বিভাগটা উপেক্ষা কর্‌লে, কি জ্ঞান কি কর্ম্ম কিছুরই গুণবৃদ্ধি হয় না। মানুষে সাহিত্যে যে ভাবের ঘর বাঁধে, সে খেলার ঘর নয়, মনের বাসগৃহ। তাসের ঘর কিণ্ডারগার্টেনেই শোভা পায়, সাবালক সমাজে নয়। সুতরাং যাঁরা মাতৃভাষার যথার্থ ভক্ত, তাঁদের পক্ষে সে ভাষাকে সাহিত্যের রাজপাটে বসাবার জন্য এখনও বহুদিন ধরে বহু চিন্তা বহুচেষ্টা কর্‌তে হবে। বঙ্গ-সরস্বতীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াই আমাদের একমাত্র কাজ নয়; তাতে ভক্তির পরিচয় দেওয়া হতে পারে, কিন্তু জ্ঞানকর্ম্মের হয় না। অতএব জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাংলা-ভাষার স্বত্বস্বামিত্ব সাব্যস্ত করবার জন্য, প্রতিপক্ষের সঙ্গে আমাদের পদে পদে তর্ক কর্‌তে হবে, বিচার কর্‌তে হবে, এবং প্রয়োজন হলে বিবাদ বিসম্বাদ করতেও প্রস্তুত হতে হবে। এক কথায় বঙ্গ-সরস্বতীর সেবককে তাঁর সৈনিকও হতে হবে।

(৪)

বিদেশী সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যের তুলনায় আমাদের স্বদেশী সাহিত্যের দারিদ্র্যের পরিচয় লাভ করে হতাশ হবার অবশ্য কোনই কারণ নেই। লোকভাষা যে, কোন দেশেই রাতারাতি স্বরাট্ হয়ে ওঠে নি, তার প্রমাণ বর্ত্তমান ইউরোপের সকল সাহিত্যের ইতিহাসেই পাওয়া যায়। অপর ভাষা অপর সাহিত্যের অধীনতাপাশ থেকে, ইউরোপের কোন নব ভাষাই একদিনে মুক্তিলাভ করতে পারে নি। সাহিত্যে সম্পুর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার পূর্ব্বে ইউরোপের অনেক দেশেই দেশী-ভাষাকে পর পর তিনটি বাধাকে অতিক্রম করতে হয়েছে। মোটামুটি ধরতে গেলে, লোকভাষার ক্রমোন্নতির ইতিহাস হচ্ছে এই :— প্রথমত কোনও মৃতভাষার, দ্বিতীয়ত কোমও বিদেশী ভাষার, এবং তৃতীয়ত কোনও কৃত্রিম ভাষার চাপ থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

প্রায় হাজার বৎসর কাল ল্যাটিন যে ইউরোপের সাহিত্যের ভাষা ছিল, এ সত্য অবশ্য আপনাদের সকলের নিকটই সুবিদিত। এই দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়সকল একমাত্র ল্যাটিন ভাষাতেই লিখিত হত। অপণ্ডিত লোকে অবশ্য ইউরোপের এই মধ্যযুগেও কথা ও কাহিনী, ছড়া ও পাঁচালি প্রভৃতি নিজ নিজ ভাষাতেই রচনা করত, কিন্তু সেই লোক-সাহিত্য শিক্ষিত সমাজে সেকালে সাহিত্য বলে গণ্য হয় নি—সুতরাং সে সাহিত্য সেকালে যে কোনরূপ পদমর্য্যাদা লাভ করে নি, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই ল্যাটিনের হাত থেকে ইউরোপীয় সাহিত্য যে বেশী দিন মুক্তিলাভ করে নি—তার প্রমাণ, Bacon তাঁর Novum Organum, Spinoza তাঁর Ethics, এমন কি Newton তাঁর Principia ল্যাটিন ভাষাতেই রচনা করেন। ইউরোপের কোনও কোনও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাটিন ভাষায় Thesis লেখবার পদ্ধতি আজও প্রচলিত আছে। আপনারা শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে, বর্ত্তমান যুগের দিগ্বিজয়ী দার্শনিক Bergson, তাঁর প্রথম গ্রন্থ, আদিতে ল্যাটিন ভাষাতেই রচনা করেন। এ ব্যাপার যথার্থই

বিস্ময়কর, কেননা ইউরোপের দার্শনিক সমাজে লিপি-চাতুর্য্যে বার্গ্‌সঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই;—তাঁর হাতের কলম যথার্থই সোণার কাঠি, যার স্পর্শে মনোজগতের শুষ্কতরুও পত্রে পুষ্পে মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে—দর্শনও কাব্য হয়ে ওঠে। লোকভাষার উপর মৃতভাষার প্রভাব ও প্রভুত্ব যে কতটা দুরপনেয়, তারই প্রমাণস্বরূপ এ ব্যাপারের উল্লেখ করলুম। জর্ম্মান দেশে আজও এমন সব পণ্ডিত আছেন, যাঁদের পাণ্ডিত্য লাটিন ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হয়,—কিন্তু তার কারণ স্বতন্ত্র। শুনতে পাই সে জাতির কোনও কোনও পণ্ডিত স্বভাষায় লিখ্‌লে, সে লেখা এত জড়ানো হয় যে, তাঁরা নিজেই তা পড়্‌তে পারেন না,—অন্যে পরে কা কথা। কাজেই তাঁদের ল্যাটিনের শরণাপন্ন হতে হয়, কেননা সেই ভাষার প্রসাদে তাঁদের মনের ময়লা কেটে যায়। সে যাই হোক, আসল ঘটনা এই যে, ইউরোপের লোকভাষাসকল যেদিন ল্যাটিন ভাষার প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভ করে' নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখলে, সেই দিন ইউরোপের মধ্যযুগের অবসান হয়ে নবযুগের সূত্রপাত হল;—এক কথায়, ইউরোপীয়দের মতে সেই শুভ দিনে ইউরোপের মনের রাত কেটে গিয়ে সেখানে দিনের আলো দেখা দিলে।

(৫)

মৃতভাষার অধীনতা হতে মুক্তিলাভ করবামাত্র দেশী ভাষা সব সময়ে একেবারে আত্মবশ হয়ে উঠতে পারে না; অনেক ক্ষেত্রে তা আবার একটি বিদেশী ভাষার শাসনাধীন হয়ে পড়ে। কোনও দেশের উপর বিদেশীর রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব, সেই দেশীয় ভাষার উপর প্রভুত্বের একটি স্পষ্ট ও প্রধান কারণ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি বিদেশী ভাষা সরকারি ভাষা হওয়া সত্ত্বেও বিজিত জাতির ভাষা ও সাহিত্যের উপর জয়লাভ করতে পারে না। রোমের অধীন হয়েও গ্রীস, পুরাকালে ভাষায় ও সাহিত্যে তার স্বরাজ্য সম্পূর্ণ রক্ষা করেছিল। ফারসিও এদেশে বহুকাল সরকারি ভাষা ছিল—কিন্তু আমাদের ভাষার উপর ফারসি ভাষার এবং আমাদের সাহিত্যের উপর ফারসি

সাহিত্যের প্রভাব একরকম নেই বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। অপরপক্ষে এমনও দেখা যায় যে, একটি বিদেশী ভাষা রাজভাষা না হয়েও অপর ভাষার উপর একাধিপত্য করেছে। বিজিত গ্রীসের সাহিত্যের হাতের নীচেই রোমের ল্যাটিন সাহিত্য গড়ে ওঠে। এ কালের ইউরোপেও এ সত্যের যথেষ্ট নিদর্শন আছে। কিছুদিনের জন্য ফরাসি ভাষা ইউরোপে একরাট—ভাষা হয়ে উঠেছিল —ইউরোপের প্রায় সকল প্রদেশের সাহিত্যই এক যুগে ফরাসি সাহিত্যের প্রতাপে অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু ইউরোপের সাহিত্যের ইভলিউসানে, ইতালির reversion যথার্থই একটা অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। যাঁরা জীবজগতের ইভলিউসানতত্ত্ব অবগত আছেন তাঁরাই জানেন যে, জীবের ক্রমোন্নতির ধারা একরোখাও নয়, একটানাও নয়। ইভলিউসানের সঙ্গে সঙ্গে reversion, উন্নতির পিঠ পিঠ অবনতিও দেখা দেয়। কিছুদূর এগিয়ে তারপর পিছুহটা বোধ হয় মানব সভ্যতারও নৈসর্গিক ধর্ম্ম, নচেৎ যে ভাষায় দান্তে, পেট্রার্কা, বোকাচ্চিয়ো, মাকিয়াভেল্লি প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত লেখকেরা কাব্যে ও ইতিহাসে সাহিত্যের অক্ষয়কীর্ত্তি সকল রেখে গিয়েছেন, সেই ভাষা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি ভাষার আনুগত্য স্বেচ্ছায় বরণ করে নিত না। ইতালির নবযুগের আদি কবি Alfieri তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন যে, তিনি তাঁর স্বকালের সাধুপদ্ধতি অনুসারে প্রথমে ফরাসি ভাষাতেই নাটক রচনা কর্‌তেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ক্রমে তাঁর এই জ্ঞান জন্মাল যে, সে-সকল নাটক, কাব্য নয়—শ্রীহীন শক্তিহীন প্রাণহীন কাঠের পুতুল মাত্র। এ কথা শুনে মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম বয়েসের কথা মনে পড়ে। এর পরেই ইতালীয় ভাষা আবার তার স্বরাজ্য লাভ করেছে। ইতালির সাহিত্যের খবর আমরা বড় একটা রাখিনে; তার কারণ, ইতালি আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের এ পারের দেশ, অর্থাৎ আমাদের এদিকের দেশ, আমাদের বিশ্বাস একালের ইতালীয়েরা পারে শুধু রাস্তায় রাস্তায় অর্গান বাজাতে, আর রঙ-বেরঙের মিষ্টান্ন তৈরি কর্‌তে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের হাতে কাব্যের

অর্গানও যে চমৎকার বাজে, এবং দর্শনের মিষ্টান্নও যে সুন্দর তৈরি হয়, তার প্রমাণ D'Annunzio এবং Benedetto Croce-র দক্ষিণ হস্তের কীর্ত্তি।

যে মার্টিন লুথারের প্রচণ্ড আক্রমণে রোমান চর্চ্চ ও ল্যাটিন ভাষার সর্ব্বজনীন প্রভুত্ব চিরদিনের জন্য ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ল, সেই মার্টিন লুথারের স্বদেশ জর্ম্মাণীর সাহিত্যও আবার পাল্‌টে ফরাসি সাহিত্যের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দী ছিল ফরাসি সাহিত্যের একটি স্বর্ণযুগ। এই সাহিত্যের প্রভাব জর্ম্মণীর শিক্ষিত মনকে প্রায় একশ' বৎসরের জন্য একেবারে অভিভূত ও মায়ামুগ্ধ করে রেখেছিল। ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত, ফরাসি সাহিত্যের অনুকরণে জর্ম্মাণীতে যে সাহিত্য রচিত হয়, তার কোনরূপ মূল্য কোনরূপ মর্য্যাদা নেই। এই ফরাসি সাহিত্যের গুণে ফরাসি ভাষাও জর্ম্মাণদের কাছে একটি নব Classic হয়ে ওঠে। নব জর্ম্মাণীর আদিকর্ত্তা Frederick the Great নিজের রসনা ও লেখনীকে সক্লেশে ফরাসি ভাষাতেই বল্‌তে ও লিখ্‌তে শিখিয়েছিলেন,—অর্থাৎ যিনি ইউরোপে জর্ম্মাণ জাতির রাষ্ট্রীয় শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, স্বয়ং তিনিই বাহোসে বাহাল-তবিয়তে এবং খোসমেজাজে ফরাসি সাহিত্য ও ফরাসি ভাষার সার্ব্বভৌমিক আধিপত্য শিরোধার্য্য করে নিয়েছিলেন। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং!

কিন্তু এর চাইতেও আশ্চর্য্যের বিষয় আছে। শুনতে পাই জগদ্বিখ্যাত জর্ম্মাণ দার্শনিক Leibnitz এই যুগে তাঁর দার্শনিক গ্রন্থসকল ফরাসি ভাষাতেই রচনা করেন—সম্ভবত এই বিশ্বাসে যে, তাঁর মাতৃভাষা দর্শন রচনার পক্ষে উপযোগী নয়। এ বিশ্বাস যে কতদূর অমূলক তার প্রমাণ, তাঁর পরবর্ত্তী এবং ইউরোপের নবযুগের অদ্বিতীয় দার্শনিক কাণ্টের গ্রন্থ সকল। সে সকল গ্রন্থ যে এ যুগের দর্শনশাস্ত্রের Classic হয়ে উঠেছে, শুধু তাই নয়,—কাণ্টের রচনার প্রসাদে ইউরোপের মনে এমন একটি ধারণা জন্মে গেছে যে, জর্ম্মাণ ভাষাই হচ্ছে দর্শন রচনা করবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী ভাষা। অতএব দেখা গেল,

মার্টিন লুথার যেমন প্রথমে ল্যাটিনের হাত থেকে উদ্ধার করে জর্ম্মান্ ভাষাকে পায়ের উপর দাঁড় করান, কাণ্ট তেমনি পরে স্বভাষাকে ফরাসির অধীনতা থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে সে ভাষাকে নিজের পায়ে চল্‌তে শেখান। স্বভাষায় আত্মপ্রকাশ করবার স্বাধীনতা লাভ করে জার্ম্মন্ সাহিত্য যে কতদূর ঐশ্বর্য্য লাভ করেছে, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ করে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত—এই একশত বৎসর হচ্ছে জর্ম্মান্ সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। এ যুগের সাহিত্যরথীদের নামের ফর্দ্দ দিতে হ'লে পুঁথি অসম্ভবরকম বেড়ে যায়, এবং সে ফর্দ্দ দেবারও কোন দরকার নেই। কাব্য দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে জর্ম্মাণ মহারথীদের নাম শিক্ষিত সমাজে কার নিকট অবিদিত? জর্ম্মান্ প্রতিভার এই আকস্মিক এবং অভূতপূর্ব্ব বিকাশের প্রত্যক্ষ কারণ এই যে, জর্ম্মান্ ভাষা এবং সেই সঙ্গে জর্ম্মান্ আত্মা তার স্বরাজ্য লাভ করেছে।

(৬)

অপরপক্ষে, যে গুণে ফরাসি ভাষা রুষীয় জর্ম্মান্ প্রভৃতি ভাষার উপর প্রভুত্ব করেছে, সেই গুণেই তা এ যাবৎ স্বীয় সুনীতি ও সুরুচি রক্ষা করে এসেছে। ফরাসি হচ্ছে বড় ঘরের সন্তান, প্রাচীন ল্যাটিনের বংশধর; সুতরাং এ ভাষা তার আত্মজ্ঞান কখনই হারায় নি, তার আভিজাত্যের অহঙ্কারই তার আত্মরক্ষার কারণ হয়েছে। ফরাসি প্রভৃতি ল্যাটিন জাতিরা বহুকাল যাবৎ জর্ম্মানদের বর্ব্বর বলেই উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে এসেছিল। বর্ব্বর শব্দের মৌলিক অর্থ হচ্ছে—সেই জাতি, যার ভাষা বোঝা যায় না। সুতরাং এ জাতি যে কস্মিন্‌কালেও অজ্ঞাত-কুলশীল জর্ম্মান্ ভাষার প্রাধান্য স্বীকার করে নি, তা বলা বাহুল্য।

এমন কি, যে জর্ম্মান্ দর্শন গত শতাব্দীতে পৃথিবীর শিক্ষিত সমাজের মনের উপর একছত্র এবং অখণ্ড রাজত্ব করেছে - সে দর্শনও ফরাসি মনকে বেশী দিন আত্মবশে রাখতে পারে নি। প্রসিদ্ধ ফরাসি লেখক Taine গত

শতাব্দীর মধ্যভাগে এই মত প্রকাশ করেন যে, জর্ম্মানী তৎপূর্ব্ববর্ত্তী একশ' বৎসর যা চিন্তা করেছে—তৎপরবর্ত্তী একশ বৎসর সমগ্র ইউরোপকে সেই চিন্তার পুনশ্চিন্তা করতে হবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী যে খেটেছে, তার প্রমাণ আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েই পাই। এ যুগের যে ইংরাজি দর্শন আমরা চর্চ্চা করি—তা যে গত যুগের জর্ম্মান্ দর্শনের পুনরাবৃত্তি মাত্র, তার পরিচয় নব-কান্টিয়ান, নব-হেগেলিয়ান প্রভৃতি নামেই পাওয়া যায়। আমরা দূর এসিয়াবাসী হয়েও, জর্ম্মান্ দর্শনকে দূরে রাখতে পারি নি; বরং সত্য কথা বলতে হলে, গত ত্রিশ বৎসর ধরে আমরাও শুধু জর্ম্মানীর তৈরি বৈজ্ঞানিকখাদ্য উদরস্থ করছি, আর তার জাবর কাটছি। মনোজগতে যে, ল্যাটিন নামক একটি প্রদেশ আছে যা কুয়াশায় ঢাকা নয়—এ কথা আমরা নিজেরা আলোর দেশের লোক হয়েও, একরকম ভুলেই গিয়েছিলুম। এক বর্ণ জর্ম্মান্ না জেনেও Nietsche-র বই আমরা অনেকেই পড়েছি এবং তাঁর কথার দুকূল-ভাসানো বন্যায় হাবুডুবুও খেয়েছি, কিন্তু ফরাসি দার্শনিক Guyot-র নাম আমরা অনেকেই শুনি নি, যদিচ উভয়েই মনোরাজ্যে একই পথের পথিক; দুয়ের ভিতর প্রভেদ এই যে, যে পথে ফরাসি Guyot ধীর পাদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছেন, সেই পথে জর্ম্মান্ Nietsche তাণ্ডবনৃত্য করেছেন। নকুলীশ-পাশুপত দর্শনে দেখতে পাই যে, পাশুপত সম্প্রদায়ের সাধনমার্গে, উপহারসংজ্ঞক ছয়প্রকার ক্রিয়া ছিল। তার মধ্যে প্রধান চারটি হচ্ছে, হা হা করে' হাস্য করা, গন্ধর্ব্ব শাস্ত্রানুসারে গীত গাওয়া, নাট্যশাস্ত্রানুসারে নৃত্য করা, এবং হুড্ডুকার করা—অর্থাৎ পুঙ্গবের ন্যায় চীৎকার করা। Nietsche-র লেখা পড়ে আমার মনে হয় যে, নকুলীশ-পাশুপত দর্শন ভারতবর্ষে তার ভবলীলা সংবরণ করে, জর্ম্মানীতে আবার পুনর্জন্ম লাভ করেছে। গেটে এবং কাণ্ট সাহিত্যের জগদ্‌গুরু হলেও, এ কথা নিঃসন্দেহ যে, বিশ্বমানবের মনের উপর আধুনিক জর্ম্মান্ মনের প্রভাব যেমন অকারণ, তেমনি মারাত্মক; কেননা জর্ম্মান্ দর্শন অপর জাতির মনের আকাশ ঘুলিয়ে দেয়। জর্ম্মান্ আত্মার অশেষ

গুণের মধ্যে একটি হচ্ছে কুয়াশা সৃষ্টি করবার শক্তি, এবং সে কুয়াশার গতিরোধ করাও যেমন কঠিন, তার প্রকোপে মনের স্বাস্থ্যরক্ষা করাও তেমনি কঠিন। এ সত্য ফরাসি জাতিই সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করে। যে সময়ে জর্ম্মান্ আত্মা আমাদের ঘাড়ে চড়্‌তে সুরু করে—ঠিক সেই সময়ে তা ফরাসিদের ঘাড় থেকে নেমে যেতে সুরু করে। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে Taine-এর একটি ধনুর্দ্ধর শিষ্য Maurice Barres, ল্যাটিনমনের উপর জর্ম্মান্ মনের এই বিজাতীয় উপদ্রবের উচ্ছেদকল্পে লেখনী ধারণ করেন। যে পুস্তকে তিনি মনোজগতে জর্ম্মান্ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন—সে পুস্তকের নাম Under the Eyes of the Barbarians। জর্ম্মান্ জাতির আদিম বর্ব্বরতা যে এ যুগে বৈজ্ঞানিক বর্ব্বরতার আকার ধারণ করেছে, বর্ত্তমান যুদ্ধের বহুপূর্ব্বে তা ফরাসি-মনীষীদের কাছে ধরা পড়ে, এবং তাও এক হিসেবে ভাষাসূত্রে। জর্ম্মান্ সাহিত্যের ফরাসি পাঠকেরা হঠাৎ আবিষ্কার করেন যে, জর্ম্মান্ অভিধানে এমন একটি কথা আছে, যা ফরাসি অভিধানে নেই—এবং সে হচ্ছে পরশ্রীকাতরতা। অপরপক্ষে জর্ম্মাণ অভিধানে humanity শব্দের সাক্ষাৎ অণুবীক্ষণের সাহায্যেও লাভ করা যায় না। মাতৃভাষা জাতির পৈতৃক প্রাণরক্ষার পক্ষে যে কতদূর সহায়, তারই প্রমাণস্বরূপ,—ঈষৎ অবান্তর হলেও,—এ ব্যাপারের উল্লেখ করলুম।

(৭)

আমি ইতিপূর্ব্বে বলেছি যে লোকভাষা, মৃতভাষা এবং বিদেশীভাষার অধীনতাপাশ মোচন করতে পারলেও, অক্লেশে সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারে না। মৌখিক ভাষার স্বরাজ্যলাভের তৃতীয় পরিপন্থী হচ্ছে পুঁথিগত কৃত্রিম-ভাষা—অর্থাৎ সাধুভাষা। এ বিষয়ে এ প্রবন্ধে আমি বেশী বাক্যব্যয় করতে চাই নে; কেননা ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ে আমি বহু বক্তৃতা করেছি; সে সব কথার পুনরুক্তি করা এ ক্ষেত্রে আমার পক্ষে প্রেয়ও নয়, শ্রেয়ও নয়; তবে কথাটা একেবারে ছেঁটে দিলে এ প্রবন্ধের অঙ্গহানি হয়, এই কারণে সংক্ষেপে এ বিষয়ে আমার মত বিবৃত করতে বাধ্য হচ্ছি।

মানুষে মৃতভাষা ত্যাগ করে যখন প্রথমে লোকভাষা অর্থাৎ মৌখিক ভাষায় লিখতে আরম্ভ করে—তখন সেই মৃতভাষার রচনাপদ্ধতির আদর্শেই রচনা করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। এর উদাহরণও ইউরোপীয় সাহিত্যে পাওয়া যায়;—পদে ও বাক্যে Latinism এর আমদানি ইংরাজির আদি গদ্য-লেখকেরাও যথেষ্ট করেছিলেন। সুতরাং আমরাও যে তা করব, সে ত নিতান্ত স্বাভাবিক। বাংলা গদ্যের বয়েস সবে একশ বছর হলেও, তা এক যুগ পিছনে ফেলে এখন দ্বিতীয় যুগে চল্‌ছে। প্রথম যুগে, সংস্কৃত গদ্যের অনুকরণে এবং সংস্কৃত শব্দের উপকরণে বাংলা গদ্য লেখা হত। যে যুগ চল্‌ছে, তাতে বাংলা গদ্য গঠিত হয়েছে ইংরাজি বাক্যের অনুকরণে এবং সংস্কৃত শব্দের উপকরণে। আমার বিশ্বাস, এখন আমরা তার তৃতীয় যুগের—অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীনতার যুগের—মুখে এসে পৌচেছি। আমার এ বিশ্বাস ভুল হতে পারে, কিন্তু একথা নিঃসন্দেহ যে, পরভাষার অনুকরণে এবং উপকরণে যে লিখিত ভাষা গঠিত হয়, সেই পুঁথিগত ভাষা অনেক অংশে নির্জ্জীব। তারপর আর একটি কথা আছে। যার জীবন আছে, তার নিত্যনূতন বদল হয়। জীবন হচ্ছে একটি ধারাবাহিক পরিবর্ত্তনের স্রোত মাত্র; সেই কারণেই জীবন্ত ভাষা ক্রমপরিবর্ত্তনশীল, এবং যুগে যুগে তা নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে; অপরপক্ষে লিখিত ভাষা অক্ষরের মধ্যে অক্ষয় হয়ে বসে থাকে। নৈসর্গিক কারণেই, লিখিত ভাষার কাছ থেকে কথিত ভাষা কালবশে এতটা দূরে সরে যায় যে, সে দুই ভাষা প্রায় দুটি বিভিন্ন ভাষা হয়ে ওঠে। তখন মৃতভাষার সঙ্গে জীবন্ত ভাষার সেই প্রাচীন বিবাদ আবার নূতন আকারে দেখা দেয়; কেননা পূর্ব্বযুগের লিখিত ভাষা পরযুগের কাছে সম্পূর্ণ মৃত না হলেও, অর্দ্ধমৃত ত বটেই। মৃতভাষার সঙ্গে জীবন্ত ভাষার বিরোধের চাইতে সাধুভাষার সঙ্গে চল্‌তি ভাষার কলহের—কলরবটা কিছু বেশী, কেননা এ হচ্চে জ্ঞাতি-শত্রুতা। তা ছাড়া লিখিত ভাষাই হচ্ছে সাহিত্য-জগতে মৌখিক ভাষার যথার্থ শিক্ষাগুরু। সুতরাং মৌখিক ভাষার

পক্ষে সাহিত্যরাজ্য অধিকার করবার প্রয়াসটা সত্য সত্যই শিষ্যের পক্ষে গুরুকে ছাড়িয়ে ওঠবার চেষ্টা। এ অবস্থায় সাহিত্যের দ্রোণাচার্য্যেরা যে সাহিত্যের একলব্যদের অঙ্গুলিচ্ছেদের আদেশ দেবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?—এতে অবশ্য ভয় পেলে স্বভাষাকে স্বরাট করে তোলা যাবে না। এ কথাটা শ্রুতিকটু হলেও সত্য যে, গুরুভক্তি না থাকলে যেমন সনাতন বিদ্যা অর্জ্জন করা যায় না, তেমনি গুরুমারা বিদ্যে না শিখলেও নূতন সাহিত্যের সর্জ্জন করা যায় না Plato, Aristotle-এর যুগ থেকে সুরু করে অদ্যাবধি, সকল দেশের সকল যুগের সাহিত্যের ইতিহাস এই সত্যের পরিচয় দিয়ে আসছে। অতএব বইয়ের ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার যুদ্ধটা নিরর্থকও নয়, নিষ্ফলও নয়। মৃতভাষার সঙ্গে জীবন্ত ভাষার, বিদেশী ভাষার সঙ্গে স্বদেশী ভাষার লড়াইও ত ঐ বইয়ের ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার জীবন-সংগ্রাম বই আর কিছুই নয়।

(৮)

ইউরোপ হতে সংগৃহীত এই ইতিহাসের আলোক বঙ্গভাষার উপর ফেলে দেখা যাক্, আমাদের মাতৃভাষার বর্ত্তমান অবস্থাটা কি? বঙ্গভাষার পুরাতত্ত্ব আমরা আজও পুরো জানি নে; কিন্তু বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস আমাদের কাছে একেবারে অবিদিত নয়। এ ইতিহাসের দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক অধ্যায় আছে। আমাদের সাহিত্যের যে যুগ গত হয়েছে সেটিকে নবাবী যুগ, এবং যে যুগ আগত হয়েছে সেটিকে সাহেবি যুগ বলা যায়।

নবাবী যুগের সাহিত্যে, ছড়া পাঁচালি পদাবলী ও সংস্কৃত কাব্যের প্রাকৃত অনুবাদ ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না; এক কথায় এ সাহিত্য হচ্ছে পদ্যে লেখা গান ও গল্পের সাহিত্য। কিন্তু নবাবী আমলে বাঙ্গালী যে একমাত্র উদরান্ন ব্যতীত অপর কোন বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করে নি, এ কথা সত্য নয়। সে যুগে এ দেশে ধর্ম্মশাস্ত্র ও ন্যায়শস্ত্রের যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল। জনরব যে, মনুসংহিতার মন্বর্থমুক্তাবলীর রচয়িতা কুল্লুকভট্ট তাহিরপুরের রাজবংশের,

এবং কুসুমাঞ্জলীর প্রণেতা উদয়নাচার্য্য, ভাদুড়িকুলের আদিপুরুষ। এ প্রবাদ সত্য বলে গ্রাহ্য করে' নেবার দিকে আমার মনের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে, কেননা আমি জাতিতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। তৎসত্বেও, প্রমাণের অসদ্ভাবহেতু এ কিম্বদন্তিতে কোনরূপ আস্থা স্থাপন করা যায় না। কিন্তু বাঙ্গালীর হাতে যে একটি নব্যন্যায় এবং একটি নব্য স্মৃতি গড়ে উঠেছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বঙ্গদেশজাত এ সকল সংস্কৃত শাস্ত্রের মূল্য যে কি, সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করবার অধিকার আমার নেই। সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত আমার জনৈক দ্রাবিড় বন্ধু বলেন যে, বাঙ্গলার নব্যন্যায় যে নব্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—কিন্তু তা ন্যায় কি-না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে! অষ্টাদশতত্ত্ব রচনা করে রঘুনন্দন বাঙ্গালী জাতির উপকার কি অপকার করেছেন, সে বিষয়েও যথেষ্ট মতভেদের অবসর আছে। কিন্তু এই সকল গ্রন্থই প্রমাণ যে—নবাবী আমলেও বাঙ্গালী জাতির বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে ঘুমিয়ে পড়ে নি, এবং বাঙ্গালী সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করতে বিচার করতে কখনই ক্ষান্ত হয় নি। কিন্তু সে যুগে আমাদের জ্ঞান ও চিন্তার একমাত্র বাহন ছিল সংস্কৃত ভাষা, যেমন মধ্যযুগে ইউরোপের ছিল ল্যাটিন। সে কালে বুদ্ধিবিদ্যার বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করবার লোকভাষার কোনই অধিকার ছিল না। সুতরাং ইংরাজ আসার পুর্ব্বে এদেশে বাংলা ছিল, মধ্যযুগে যাকে বলত একটি vulgar tongue-অর্থাৎ ইতর ভাষা।

ইংরাজি আমলে বংলা সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু আমাদের দর্শন বিজ্ঞানের বাহন আজ সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে ইংরাজি হয়েছে। কথাটা যে সত্য তার প্রমাণ স্বরূপ দু' একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। সার জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং ডাক্তার ব্রজেন্দ্র নাথ শীল প্রভৃতি দেশপূজ্য মনীষীগণ তাঁদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থসকল ইংরাজি ভাষাতেই রচনা করেন। অর্থাৎ Leibnitz-এর যুগে জর্ম্মন্ ভাষার যে অবস্থা ছিল—আজ এই বিংশ শতাব্দীতে বংলা ভাষা ঠিক সেই অবস্থাতেই আছে,—

সাহিত্যের স্কুলে আজও তা প্রমোসন পায় নি, তার ইতরতার কলঙ্ক আজও ঘোচে নি।

(৯)

বলা বাহুল্য বঙ্গসাহিত্য যতদিন কেবলমাত্র গল্প ও গানের গণ্ডীর ভিতর আটক থাকবে—ততদিন শিক্ষিত সমাজে বঙ্গভাষা যথার্থ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। কেননা শ্রেষ্ঠকাব্য সাহিত্যের মুকুটমণি হলেও, সস্তা কথা ও গাথা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। নিকৃষ্ট কাব্যসাহিত্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াতে কোন সাহিত্যেরই গৌরব বৃদ্ধি হয় না, এবং অক্ষম হস্তের অযত্নপ্রসূত গান ও গল্প প্রায়ই উৎকৃষ্ট হয় না; কেননা যথার্থ কাব্যসৃষ্টির জন্য চাই স্রষ্টার প্রাক্তনসংস্কার এবং অসামান্য প্রতিভা। এবং সকলেই অবগত আছেন যে, প্রতিভাশালী লেখক এবেলা ওবেলা হাটে বাজারে মেলে না। হালে বঙ্গসাহিত্যের একটি নূতন চাল দেখে আমি ঈষৎ ভীত হ'য়ে পড়েছি। সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে রসমাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও রসতত্ত্ব-বিচারের বেজায় ধুম পড়ে গিয়েছে। এতে অবশ্য ভয়ের কোনও কারণ থাকৃত না, যদি না সাহিত্যে রসের লোভে তার সারের দিকটা উপেক্ষা করবার একটা সম্ভাবনা এসে পড়্‌ত। কদলী বৃক্ষের অন্তরে সার নেই—আছে কেবল রস; সে কারণ আমরা যদি বঙ্গসাহিত্যে সেই নিটোল সুগোল মসৃণ চিক্কণ নধর সরস বৃক্ষের চাষের প্রশ্রয় দিই, তাহলে বঙ্গসরস্বতীর কপালে নিশ্চয়ই শুধু কদলী ভক্ষণই লেখা আছে। এস্থলে আমি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে,—ভাষার উৎপত্তি কর্ম্মে, আর তার পরিণতি জ্ঞানে। ভাষা ব্যতীত মানুষের চিন্তা প্রকাশ করবার অপর কোনও উপায় নেই। অপরপক্ষে আমরা যাকে বলি রস, আর ইংরাজরা emotion,—সে বস্তু প্রকাশ করবার নানা উপায় আছে—যথা, স্বেদ কম্প মূর্চ্ছা বেপথু শিৎকার চিৎকার প্রভৃতি। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, জ্ঞান ও চিন্তার বাহন হয়েই ভাষা তার স্বরূপ ও স্বরাজ্য লাভ করে। কাব্য সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করে, কেননা একমাত্র কাব্যেই, জ্ঞানের ভাষা

কর্ম্মের ভাষা ও ভক্তির ভাষা, এই ত্রিধারার ত্রিবেণীসঙ্গম হয়। তিনিই যথার্থ কবিপদবাচ্য, যাঁর হৃদয়রসের সঙ্গে বহুলপরিমাণে জ্ঞানের সার, যাঁর বুকের রক্তের সঙ্গে অনেকখানি মনের ধাতু অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশ্রিত থাকে। সত্য ও সুন্দর যে কারও কারও হাতে একই বস্তু হ'য়ে ওঠে, তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ কলিদাস সেক্‌স্‌পিয়ার দান্তে মিলটন গেটে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাকবিদের কাব্য।

সুতরাং বঙ্গ সাহিত্যের বর্ত্তমান অজ্ঞান অবস্থা আমাদের কাছে মোটেই সন্তোষজনক নয়। বঙ্গসরস্বতী কালে যে আমাদের মনোজগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হবেন—এই দুরাশাই আমাদের উচ্চ:আশা। অতএব কি অবস্থায় এবং কি কারণে লোকভাষা পরবশ হয়ে পড়ে, আর কি ব্যবস্থায় এবং কি উপায়ে তা আত্মবশ হ'য়ে ওঠে, তারও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা দরকার। অবস্থা বুঝ্‌লে তার ব্যবস্থা করা সহজ। মাতৃভাষাকে স্বপ্রতিষ্ঠ করবার লোভ যে আমরা কিছুতেই সম্বরণ কর্‌তে পারি নে, তার কারণ আমরা জানি যে "সর্ব্বং আত্মবশং সুখং" আর "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং।

(১০)

জীবন্ত ভাষার উপর মৃত ভাষার প্রভুত্বের কারণ নির্ণয় করবার জন্য, ল্যাটিনের উদাহরণ নেওয়া যাক্। পুরাকালে ল্যাটিন যে ইউরোপের পশ্চিম-ভাগের উপর একাধিপত্য ক'রেছিল তার কারণ, সেকালে ল্যাটিন ছিল সে ভূভাগের রাজভাষা। গ্রীকভাষা সে যুগে রোমানদের বিদ্যাশিক্ষার ভাষা হ'লেও, সে ভাষা রাজভাষা নয় বলে রোমের অধীনস্থ অপর দেশসকলে তা অপরিচিত ছিল। তবে রোমান সম্রাজ্যের ধ্বংশের পরও ল্যাটিন যে আর এক হাজর বছর ধ'রে ইউরোপে নির্ব্বিবাদে প্রভুত্ব করে—তার কারণ রোম তার রাজত্ব হারিয়ে স্বর্গত্ব লাভ করলে ;—যে রোম ছিল প্রাচীন যুগের কর্ম্মরাজ্যের কেন্দ্র, সেই রোম হ'য়ে উঠল মধ্যযুগের ধর্ম্মরাজ্যের Eternal City, অর্থাৎ অমরাপুরী। এক কথায়, রোমানরা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করবার পর ল্যাটিন হল দেবভাষা। কোনও বিশেষ ধর্ম্মের ভাষা, অর্থাৎ যজনযাজ

ধ্যান-ধারণা উপাসনা-আরাধনা তন্ত্র-মন্ত্র স্তব-স্তোত্রের ভাষা যে, সেই ধর্ম্মাবলম্বী লৌকিক মনের অলৌকিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করে,—বিশেষত সে ভাষার অর্থ যদি জনগণের জানা না থাকে,—এ সত্য ত জগদ্বিখ্যাত। ল্যাটিনের প্রতাপ ইউরোপে আজও অক্ষুণ্ণ থাকৃত, যদি না Renaissance এবং Reformation ইউরোপের মনকে রোমান-চর্চ্চের একান্ত বশ্যতা থেকে মুক্ত করৃত। মধ্যযুগের শেষভাগে গ্রীক সাহিত্যের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ মানুষের স্বাধীনচিন্তা ও স্বোপার্জ্জিত জ্ঞানের সাক্ষাৎ লাভ করৃলে। এর ফলে, রোমের ধর্ম্ম-মন্দিরের অটল ভিত টলটলায়মান হ'ল, এবং সেই সঙ্গে ল্যাটিন ভাষারও দৈবশক্তি লোপ পাবার উপক্রম হল। গ্রীক ভাষার প্রভূত ঐশ্বর্য্য ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের তুলনায় ল্যাটিন ভাষা ইউরোপের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চোখে ক্ষীণসত্ত্ব ও হীনপ্রভ হয়ে পড়ল। এই গ্রীক সাহিত্যের চর্চ্চায় সে যুগের মনীষিগণ নূতন দর্শন বিজ্ঞানের সৃষ্টি করৃতে ব্যগ্র হলেন। কিন্তু স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত দর্শন বিজ্ঞান, সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মতন্ত্রকে বিচলিত করতে পারলেও, বিপর্য্যস্ত করতে পারে না। এক ধর্ম্মমতের স্থান অধিকার করতে পারে শুধু আরেক ধর্ম্মমত। তাই লুথারের প্রবর্ত্তিত Reformation-ই জর্ম্মানিক ভাষাসমূহকে ল্যাটিনের অধীনতা থেকে যথার্থ মুক্তি দান করলে।

(১১)

লুথার যেদিন জর্ম্মানীর লোকভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করৃলেন, সেই দিনই জর্ম্মাণ সাহিত্যের পাকা বুনিয়াদের পত্তন হল। ভাষার সঙ্গে ধর্ম্মের সম্পর্ক যে অতি ঘনিষ্ঠ, এ সত্য সকলের নিকট সুস্পষ্ট না হলেও, নিঃসন্দেহ। মানুষের মনের বাইরে ভাষা নেই, এবং ভাষার বাইরেও মন নেই। ভাষা ও মন হচ্ছে একই বস্তুর অন্তর ও বাহির। সুতরাং ধর্ম্মমত ভাষান্তরিত হলে, রূপান্তরিত হতে বাধ্য। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। ইউরোপ খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করবার অব্যবহিত কাল পরেই সে দেশে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক খৃষ্ট

সংঘের সৃষ্টি হল,—একটি রোমে আর একটি কন্‌ষ্টান্টিনোপলে। রোমান সাম্রাজ্য তার অধঃপতনের মুখে যে-দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, খৃষ্টধর্ম্ম তার অভ্যুত্থানের মুখে ঠিক সেই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এর মূল কারণ যে ভাষার পার্থক্য, তার পরিচয় এ দুটি সংঘের নামেই পাওয়া যায়;— একটির নাম গ্রীক চর্চ্চ, অপরটির রোমান। New Testament যদি গ্রীক, অর্থাৎ—ইউরোপের ভাষায় লেখা না হ'ত, তাহলে এসিয়ার ধর্ম্ম ইউরোপে গ্রাহ্য হ'ত কি না, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। ভাষার শক্তিতে আমি এতটাই বিশ্বাস করি। এদেশের বৌদ্ধধর্ম্মও যে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তার মূলেও ছিল ঐ ভাষার পার্থক্য। মহাযানের ভাষা সংস্কৃত, এবং হীনযানের পালি।

অপরপক্ষে পৃথিবীতে যখন কোন নূতন ধর্ম্মমত জন্মলাভ করে, তখন তার বাহন হয় একটি নূতন ভাষা। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়েছিল পালিতে, এবং জৈনধর্ম্ম মাগধী প্রাকৃতে;—সুতরাং লুথার যখন খৃষ্টধর্ম্মের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করলেন, তখন তাঁকে ল্যাটীন ত্যাগ করে জর্ম্মান ভাষারই আশ্রয় নিতে হল। তিনি এ উপায় অবলম্বন না করলে Protestantism ইউরোপে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্ম হিসেবে কখনই প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারত না। তার প্রমাণ, ল্যাটিনের অপভ্রংশ যাদের মাতৃভাষা, ইউরোপের সেই সকল জাতি আজিও রোমান ক্যাথলিক; রোমান্স ভাষাই রোমান চর্চ্চের সঙ্গে তাদের মনের প্রধান যোগসূত্র। অপরপক্ষে যে-সকল জাতির ভাষা জর্ম্মানিক, সেই সকল জাতিই প্রটেষ্টাণ্ট। একই কারণেই বাংলা সংস্কৃতের প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভ করেছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরেই বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয়েছে। মহাপ্রভু যেদিন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে বৈষ্ণব ধর্ম্মের, জ্ঞান ও কর্ম্মের উপরে ভক্তির প্রাধান্য প্রচার করতে উদ্যত হলেন, সেদিন তাঁকে সংস্কৃত ত্যাগ করে বাংলার আশ্রয় নিতে হল। চৈতন্যের ধর্ম্ম সংস্কারকে বাংলাদেশের Reformation বলা অসঙ্গত নয়। তারপর এসেছে

আমাদের Renaissance;—ইউরোপ একদিন যেমন গ্রীক সাহিত্য আবিষ্কার করে ল্যাটিন ভাষার একাধিপত্য থেকে মুক্তি লাভ করে, আমরাও তেমনি ইংরাজি সাহিত্য আবিষ্কার করে সংস্কৃত ভাষার একাধিপত্য হতে মুক্তি লাভ করেছি, এবং সে একই কারণে। পশ্চিম ইউরোপে গ্রীক, ধর্ম্মের নয়, বিদ্যাশিক্ষার ভাষা বলেই গ্রাহ্য হয়েছিল; আমাদের কাছেও ইংরাজি তেমনি, ধর্ম্মের নয়, বিদ্যাশিক্ষার ভাষা বলেই গ্রাহ্য হয়েছে। ল্যাটিন অবশ্য তাই বলে ইউরোপে বাতিল হয়ে যায় নি;—সে ভাষার অধ্যয়ন অধ্যাপনা আজও সে দেশে সজোরে চল্‌ছে। কিন্তু সে বিদ্যাশিক্ষার ভাষা হিসাবে। অবশ্য রোমান ক্যাথলিক-জাতির কাছে সে ভাষা আজও কতকপরিমাণে ধর্ম্মের ভাষা বলে মান্য, কিন্তু প্রধানত বিদ্যাশিক্ষার ভাষা বলেই গণ্য। আমাদের বাঙালীদের কাছে সংস্কৃত আজকের দিনে ঐ হিসাবেই গণ্য ও মান্য।

(১২)

অতএব দেখা গেল যে পরভাষা, তা মৃতই হোক আর বিদেশীই হোক, লোকভাষার উপর প্রভুত্ব করে এই গুণে যে, তা জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাষা, এক কথায় বিদ্যাশিক্ষার ভাষা; বলা বাহুল্য ধর্ম্মের ভাষাও আসলে বিদ্যার ভাষা। অপর বিদ্যার সঙ্গে এ বিদ্যার প্রভেদ এই যে, তা অপরা বিদ্যা নয়—তা হচ্ছে theology, অর্থাৎ—ব্রহ্মবিদ্যা। এই গুণেই ইংরাজি আজ বাংলার উপর প্রভুত্ব করছে। এ প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাংলাকে বিদ্যাশিক্ষার ভাষা, অধ্যয়ন অধ্যাপনার ভাষা, এক কথায় বিদ্যালয়ের ভাষা করে তোলা। আমাদের উচ্চ আশা এই যে, ভবিষ্যতে বাংলা উচ্চশিক্ষার ভাষা হবে; শুধু বাল্য বিদ্যালয়ে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়েও এ ভাষা পাবে প্রথম আসন, এবং ইংরাজি দ্বিতীয় আসন গ্রহণ করবে। যতদিন বাংলা, হয় বিদ্যালয়ের বহির্ভূত হয়ে থাকবে; নয় ইংরাজির অনুচর কিম্বা পার্শ্বচর হিসাবে সেখানে

স্থান পাবে, ততদিন বাংলা সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বশক্তিশালী হয়ে উঠবে না। এবং বাঙালীর প্রতিভাও ততদিন পূর্ণ বিকাশ লাভ করবার পূর্ণ সুযোগ পাবে না। সাহিত্যেই জাতীয় মনের প্রকাশ, অতএব সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যেই জাতীয় মনের ঐশ্বর্য্যের পরিচয়। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, ভাষা ও মন একই বস্তুর এ পিঠ আর ওপিঠ। বাংলা ভাষাকে বিদ্যালয়ের ভাষা করে তোলবার পথে কত এবং কি গুরুতর বাধা আছে, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন, তৎসত্ত্বেও আমি বলি, সে-সকল বাধা আমাদের অতিক্রম করতেই হবে—নচেৎ বাঙালীর মন চিরকাল অর্দ্ধপক্ক অবস্থাতেই থেকে যাবে। বঙ্গ সাহিত্যের গুরুগম্ভীর প্রবন্ধনিবন্ধাদি পাঠ করলেই দেখা যায় যে, সে সকল রচনা কোনও অংশে পাকা আর কোনও অংশে কাঁচা। এ সব লেখার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের একটা পারিবারিক সাদৃশ্য আছে। পঠিত পুস্তকের স্মৃতি লেখকদের যেখানে অক্ষুণ্ণ সেখানে লেখা পাকা, আর যেখানে ক্ষুণ্ণ, সেখানে কাঁচা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে মনের পরিচয় পেয়ে ইউরোপ যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে, সেই পক্ক কষায় মন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একান্ত দুর্লভ। এর কারণ, আমাদের মনকে দিবারাত্র পরভাষার জাগ দিয়ে অকালপক্ক করে তোলা হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের ভাষা না হলে আমাদের ভাষা যে তার পূর্ণশ্রী পূর্ণশক্তি লাভ করবে না, একথাও যেমন সত্য, অপরপক্ষে আমাদের সাহিত্য, জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহিত্য না হলেও যে তা বিদ্যালয়ে গ্রাহ্য হবে না, এ কথাও তেমনি সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় লিখেছেন—

"এদিকে কোন সুশিক্ষিত বাঙ্গালীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় "মহাশয় আপনি বাঙ্গালী, বাঙ্গালা গ্রন্থ বা পত্রাদিতে আপনি এত হতাদর কেন"? তিনি উত্তর করেন "কোন্ বাঙ্গলা গ্রন্থে বা পত্রে আদর করিব? পাঠ্য রচনা পাইলে অবশ্য পড়ি"। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে এ কথার উত্তর নাই"।

আজকের দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা যদি আমাদের ঐরূপ প্রশ্ন করেন, তাহলে আমাদেরও মুক্তকণ্ঠে না হোক্ রুদ্ধকণ্ঠে স্বীকার করতে হবে যে, সে প্রশ্নের উত্তর নেই। তবে আমাদের এ ক্ষেত্রে কর্তব্য যে কি, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ;—বাংলা ভাষায় আমাদের বিদ্যার সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে, এবং সে জন্য বহু শিক্ষিত লোককে কায়মনোবাক্যে বহুদিন ধরে পরিশ্রম করতে হবে। ইতি মধ্যেই আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মাতৃভাষাতেই ইতিহাস এবং দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসকল রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন ; কিন্তু সে সাহিত্যের যে তেমন কিছু গৌরব, কিম্বা সৌরভ নেই তার কারণ, একদিকে ইংরেজি ভাবের আর একদিকে সংস্কৃত ভাষার চাপের মধ্যে পড়ে, আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে ভাবতেও পারি নে, মুক্তহস্তে লিখতেও পারি নে।

(১৩)

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, মৃতভাষা ও পরভাষার প্রভুত্ব থেকে মাতৃভাষাকে আমি মুক্ত করতে চাই বলে, এ ভুল যেন কেউ না করেন যে, আমি সংস্কৃত ও ইংরাজির পঠনপাঠন বন্ধ করে দিতে চাই। আমার বিশ্বাস, তা করলে বঙ্গ সাহিত্যে ইভলিউসান হওয়া দূরে থাক্, একটা বিষম ও সম্ভবত ভীষণ reversion এসে পড়বে। সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্যের চর্চা থেকেই আমরা সেই মনের বল ও হাতের কৌশল লাভ করব, যা আমাদের সাহিত্যের মুক্তির কারণ হবে। বর্তমানে ইউরোপের সকল ভাষাই গ্রীক ল্যাটিনের অধীনতা হতে মুক্তিলাভ করেছে, কিন্তু তাই বলে সে দেশে গ্রীক ল্যাটিনের অধ্যাপনা বন্ধ হয় নি। বরং সাহিত্য-রাজ্যে ইউরোপের এই স্বদেশী যুগে উপরোক্ত ক্ল্যাসিকের চর্চা যত গভীর ও বিস্তৃত হয়েছে, ক্ল্যাসিক-শাসিত যুগে তার সিকির সিকিও হয় নি।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, ক্লাসিক চর্চা করবার সার্থকতা কি ? তাহলে সে দেশের কাব্যরসের রসিক উত্তর দেবেন যে, ঐ দুটি প্রাচীন ভাষায় যে কাব্যামৃত সঞ্চিত রয়েছে, তার রসাস্বাদ না করলে মানব জনম বিফল হয় ;

দার্শনিক বলবেন, মনের উদারতা ও হৃদয়ের গভীরতা লাভ করবার জন্য অতীতের সাহিত্যের পরিচয় লাভ করা একান্ত প্রয়োজন ; বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করতে উদ্যত হবেন যে, অতীতের সভ্যতার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় না থাকলে, আমরা বর্ত্তমান সভ্যতার যথার্থ প্রকৃতি ও মতিগতির পরিচয় পাব না, কেননা বর্ত্তমানের ক্রমগঠিত হয়েছে অতীতের গর্ভে ; এবং আর্টিষ্ট দেখিয়ে দেবেন যে, ক্লাসিক সাহিত্যের এমন একটি গুণ আছে, যা বর্ত্তমান সাহিত্যে পাওয়া দুর্ঘট এবং সে গুণের নাম হচ্ছে আভিজাত্য। এ সকল উক্তিই সত্য ; সুতরাং সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক চর্চ্চা আমাদের চিরদিনই করতে হবে। বলা বাহুল্য পৃথিবীর অসংখ্য মৃত-ভাষার মধ্যে, গ্রীক ল্যাটিন ও সংস্কৃত, এই তিনটি আর্য্য ভাষাই ক্লাসিক—অপর কোনোটিই নয়। এ স্থানে একটি কথার উল্লেখ করা দরকার। অলঙ্কারশাস্ত্রের ভাষায় বলতে গেলে, ইউরোপে গ্রীক ল্যাটিনের বাণী সেকালে ছিল প্রভুসম্মিত, একালে তা হয়েছে সুহৃদ্-সম্মিত, অর্থাৎ—আগে যা ছিল বেদবাক্য, এখন তা হয়েছে ন্যায়কথা! আশা করি কালে সংস্কৃতসরস্বতীর বাণীও আমাদের কাছে তার প্রভুসম্মিত চরিত্র হারিয়ে সুহৃদ্সম্মিত হয়ে উঠবে। তা যে দূর ভবিষ্যতেও কান্তাবাণী হয়ে উঠবে, সে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। এই তিনটি ক্লাসিকের মহা গুণ এই যে, তার প্রত্যেকটিই পুরুষালি সাহিত্য, মেয়েলি নয় ;—সে সাহিত্যে আধ আধ ভাষ কিম্বা গদগদ ভাষের স্থান নেই, সে সাহিত্য যেখানে কোমল সেখানে দুর্ব্বল নয়, যেখানে সানুরাগ সেখানে সানুনাসিক নয়। এ কারণেও সংস্কৃতের চর্চ্চা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং অবশ্যকর্ত্তব্য, কেননা বাংলার বাণীর কান্তাসম্মিত হয়ে পড়বার দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক এবং রোখ আছে।

আজকের দিনে ইউরোপের কোনও ভাষাই অপর কোনও ভাষার আওতায় পড়ে নেই,—সে ভূভাগে এখন সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান ; অথচ সে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই জাতিস্বাতন্ত্র্যের যুগেও স্বদেশী ভাষা

ব্যতীত আরও অন্তত ছুটি তিনটি বিদেশী ভাষা সাগ্রহে এবং সানন্দে শিক্ষা করেন। এর কারণ কি?—এর কারণ, সভ্যজগতের এ জ্ঞান জন্মেছে যে, মানুষের মনোজগৎ কেউ আর এক হাতে গড়ে নি, এর ভিতর নানা যুগের নানা দেশের হাত আছে। সে কারণ, বিদেশী ভাষা ও বিদেশী সাহিত্যের চর্চ্চা ছেড়ে দিলে, মানুষকে মনোরাজ্যে একঘরে এবং কুণো হয়ে পড়তে হয়। একমাত্র জাতীয় সাহিত্যের চর্চ্চায় মানুষের মন জাতীয় ভাবের গণ্ডীর মধ্যেই থেকে যায়, এবং এ বিষয়ে বোধহয় দ্বিমত নেই যে, মনোরাজ্যে কূপমণ্ডুক হওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়,—সে কূপের পরিসর যতই প্রশস্ত, ও তার গভীরতা যতই অগাধ হোক না কেন। এবং এ কথাও অস্বীকার করবার জো নেই যে, যে-জাতি মনে যতই বড় হোক্ না কেন, তার মনের একটা বিশেষরকম সঙ্কীর্ণতা আছে, এবং তার মনের ঘরের দেয়াল ভাঙ্গবার জন্য বিদেশীমনের ধাক্কা চাই। বিদেশীর প্রতি অবজ্ঞা, বিদেশী মনের অজ্ঞতা থেকেই জন্মলাভ করে এবং এই সূত্রে জাতির প্রতি দ্বেষ হিংসাও প্রশ্রয় পায়। অপরের মনের সম্পর্কে এলে, তার সঙ্গে মনের মিল হওয়াটা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; কেননা তখন দেখা যায় যে, অপর জাতির লোকেরাও আসলে মানুষ, এবং অনেকটা আমাদের মতই মানুষ। সুতরাং বিদেশী সাহিত্যের চর্চ্চায়, শুধু আমাদের মন নয়, হৃদয়ও উদারতা লাভ করে, আমরা শুধু মানসিক নয়, নৈতিক উন্নতিও লাভ করি। অতএব মনোজগতে যথার্থ মুক্তি লাভ করতে হলে, আমাদের পক্ষে বিশ্বমানবের মনের সংস্পর্শে আসা দরকার। সত্য কথা এই যে, মনোজগতে বৈচিত্র্য থাকলেও কোনও দেশভেদ নেই; আমরা আমাদের মনগড়া বেড়া দিয়ে তার মনগড়া ভাগ বাটোয়ারা করি,—সত্যের আলোকে এ সব অলিক প্রাচীর কুয়াশার মত মিলিয়ে যায়। এ কথা আমি বিশ্বাস করি বলে, আমার মতে, আমাদের পক্ষে শুধু ইংরাজি নয়, সেই সঙ্গে ফরাসি এবং জর্ম্মানও শেখা দরকার। ইংরাজি ভাষা অবশ্য সমগ্র ইউরোপের সমস্ত জ্ঞান ও চিন্তা আমাদের মনের ঘরে পৌছে দিচ্ছে, কিন্তু

অনুবাদের মারফৎ সাহিত্য পড়া গ্রামোফোনের মারফৎ গান শোনার মত; অর্থাৎ—ও উপায়ে মানুষের প্রাণের কথা আমাদের কানে যন্ত্রধ্বনির আকারে এসে পৌঁছায়। সে যাই হোক্, আজকের দিনে ইংরাজির চর্চ্চা ত্যাগ করলে বিশ্বমানবের বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার স্বহস্তে বন্ধ করে দেওয়া হবে। বাংলা আমাদের শিক্ষার প্রধান ভাষা হলে ইংরাজি-বাণী আর প্রভুসম্মিত থাকবে না, সুহৃদ্‌সম্মিত হয়ে উঠবে—প্রভু তখন যথার্থ সখা হয়ে উঠবে। আর একটি কথা বলেই আমার প্রবন্ধ শেষ করব।

(১৪)

আজকের দিনে ভারতবাসীর মুখে "স্বরাজ" ছাড়া অপর কোনও কথা নেই। দেশের স্বরাজ্য পরের কাছে হাত পেতে পাওয়া যায় কি যায় না, তা আমি বলতে পারি নে; কিন্তু এ কথা আমি খুব জোরের সঙ্গে বল্‌তে পারি যে, মনের স্বরাজ্য নিজহাতে গড়ে তুলতে হয়। তার পর দেশের স্বরাজ্য ইংরাজি ভাষার প্রতাপে লাভ করা গেলেও, মনের স্বরাজ্য একমাত্র স্বভাষার প্রসাদেই লাভ করা যায়। সুতরাং সাহিত্যচর্চ্চা আমাদের পক্ষে একটা সখ নয়, জাতীয় জীবন গঠনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়—কেন না এ ক্ষেত্রে যা কিছু গড়ে উঠবে, তার মূলে থাকবে জাতীয় আত্মা এবং জাতীয় কৃতিত্ব।

এক জাতের বুদ্ধিমান লোক আছেন যাঁরা বলেন যে, আমাদের পক্ষে একটা বড় সাহিত্য গড়ে তোলবার চেষ্টাটা সম্পূর্ণ বৃথা। তাঁদের মতে সাহিত্যের অভ্যুদয় জাতীয় অভ্যুদয়কে অনুসরণ করে। এবং নিজের মতের স্বপক্ষে তাঁরা Pericles-এর Athens, Augustus-এর রোম, Elizabeth-এর ইংলণ্ড এবং Louis xiv-এর ফ্রান্সের নজির দেখান। এ মত গ্রাহ্য করার অর্থ, আত্মার উপর বাহ্যবস্তুর শক্তির প্রাধান্য স্বীকার করা। কিন্তু অদৃষ্টবাদ মানুষের পুরুষকারকে খর্ব্ব করে, অতএব বিজ্ঞানসম্মত হলেও তা অগ্রাহ্য। সুখের বিষয় এ মত মেনে নেবার কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ নেই। যদি সাহিত্যের অভ্যুদয় একমাত্র রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভর করত, তাহলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে

জর্ম্মানীতে অমন অপূর্ব্ব সাহিত্যের সৃষ্টি হত না, কারণ সে যুগে জর্ম্মানীর রাষ্ট্রীয়-শক্তি শূন্যের কোঠায় গিয়ে পড়েছিল। নেপোলিয়ান যেদিন সমবেত জর্ম্মান জাতিকে পদদলিত করে Jena নগরে প্রবেশ করেন, সেদিন সে নগরে গেটে ও হেগেল উভয়েই উপস্থিত ছিলেন, এবং সম্ভবত এঁদের একজন কাব্যের, আর একজন দর্শনের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন ; কেননা বিজয়ী ফরাসিদের তোপের গর্জ্জন যে এঁদের যোগনিদ্রা ভঙ্গ করেছিল—এ কথা ইতিহাসে লেখে না। আর এ যুগে জর্ম্মান জাতি সাংসারিক হিসাবে অপূর্ব্ব অভ্যুদয় লাভ করেছে কিন্তু জর্ম্মান সাহিত্য সে অভ্যুদয়ের অনুসরণ করে নি। বরং সত্য কথা এই যে, সে দেশে লক্ষ্মীর আস্ফালনে সরস্বতী পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়েছেন।

আসল ঘটনা এই যে, যুগবিশেষে দেশবিশেষের জাতীয় আত্মা যখন সজ্ঞান ও সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখন কি সাহিত্য কি সমাজ সবই এক নূতন শক্তি লাভ করে, এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে। তখন জাতির আত্মশক্তি নানা দিকে নানা ক্ষেত্রে বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। Pericles-এর Athens প্রভৃতি এই সত্যের নিদর্শন। কিন্তু এমন হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে, জাতীয় আত্মা প্রবুদ্ধ হয়ে উঠলেও অবস্থার গুণে বা দোষে তা বিশেষ একটা দিকেই মাথা তুলতে পারে,—হয় সাহিত্যের দিকে, নয় শিল্পবাণিজ্যের দিকে। সুতরাং জাতি হিসাবে আমরা শক্তিশালী নই বলে, আমাদের সাহিত্য-সৃষ্টির চেষ্টা যে বিড়ম্বনা, তা হতেই পারে না। তা ছাড়া সাহিত্যের প্রধান কাজই যখন জাতীয় আত্মাকে প্রবুদ্ধ করা, তখন তার অবসর চিরকালই আছে। আমার শেষ কথা এই যে, বাংলার ভবিষ্যৎ ও বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ মূলে একই বস্তু।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৪ শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বই পড়া।*

প্রবন্ধ আমি লিখি এবং সম্ভবত যত লেখা উচিত তার চাইতে বেশিই লিখি, কিন্তু সে প্রবন্ধ সর্ব্বজনসমক্ষে পাঠ করতে আমি স্বভাবতই সঙ্কুচিত হই। লোকে বলে আমার প্রবন্ধ কেউ পড়ে না। যে প্রবন্ধ লোকে স্বেচ্ছায় পড়ে না, সে প্রবন্ধ অপরকে পড়ে শোনানটা অবশ্য শ্রোতাদের উপর অত্যাচার করারই সামিল।

এ সত্ত্বেও আমি আপনাদের অনুরোধে আজ যে একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে প্রস্তুত হয়েছি তার কারণ, লাইব্রেরি সম্বন্ধে কথা কইবার আমার কিঞ্চিৎ অধিকার আছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে 'সাহিত্য' পত্রে আমার সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশিত হয় যে, আমি একজন "উদাসীন গ্রন্থকীট"। এর অর্থ, কোনও কোনও লোক যেমন সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে বনে গমন করেন, আমিও তেমনি সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে লাইব্রেরিতে আশ্রয় নিয়েছি। পুস্তকাগারের অভ্যন্তরে আমি যে আজীবন সমাধিস্থ হয়ে রয়েছি, এ জ্ঞান আমার অবশ্য ইতিপূর্ব্বে ছিল না। সে যাই হোক্, আমার আ-কৈশোর বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির দত্ত এই সার্টিফিকেটের বলে এ ক্ষেত্রে বই পড়া সম্বন্ধে দু'চার কথা বলতে সাহসী হয়েছি। লাইব্রেরিতে বইয়ের গুণগান করাটা আমার বিশ্বাস অসঙ্গত হবে না।

(২)

আজকের সভায় যে দু'চার কথা বলব, সে আলাপের ভাষায় ও আলাপের ভাবে, অর্থাৎ—তাতে কাজের কথার চাইতে বাজে কথা ঢের বেশি থাকবে।

---

* কটেজ লাইব্রেরি ও ভবানীপুর ইন্‌ষ্টিটিউটের সাহিত্য-শাখার অধিবেশনে ১৯১৮ সনের ১৯শে মে তারিখে পঠিত।

এই বিংশ শতাব্দীতে লাইব্রেরির সার্থকতা এবং উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ কোনও কথা বলবার কি প্রয়োজন আছে? এ সম্বন্ধে যা বক্তব্য তা ইতিপূর্ব্বে হাজার বার কি বলা হয় নি? তবে বই পড়ার অভ্যাসটা যে বদ্-অভ্যাস নয়, এ কথাটা সমাজকে এ যুগে মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক; কেন না মানুষে এ কালে বই পড়ে না—পড়ে সংবাদপত্র। এ যুগে সভ্য সমাজ ভোরে উঠে করে দু'টি কাজ—এক চা-পান আর সংবাদপত্র পাঠ। একটি বিলাতি কবি চায়ের সম্বন্ধে বলেছেন যে, "The cup that cheers but not inebriates", অর্থাৎ,—চা-পান কর্‌লে নেশা হয় না অথচ ফূর্ত্তি হয়। চা-পান কর্‌লে নেশা না হোক্, চা-পানের নেশা হয়। সংবাদপত্র সম্বন্ধেও ঐ একই কথা খাটে। তারপর অতিরিক্ত চা পানের ফলে মানুষের যেমন আহারে অরুচি হয়, অতিরিক্ত সংবাদপত্র পাঠের ফলেও মানুষের তেমনি সাহিত্যে অরুচি হয়। আমরা দেশসুদ্ধ লোক আজকের দিনে এই মানসিক মন্দাগ্নিগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। সুতরাং সাহিত্যচর্চ্চা করবার প্রথাটা যে সভ্যতার একটা প্রধান অঙ্গ, এই সত্যটার চারদিকে আজ প্রদক্ষিণ করবার সংকল্প করেছি।

(৩)

কাব্যচর্চ্চা না কর্‌লে মানুষে জীবনের একটা বড় আনন্দ থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হয়। এ আনন্দের ভাণ্ডার সর্ব্বসাধারণের ভোগের জন্য সঞ্চিত রয়েছে। সুতরাং কোনও সভ্যজাতি কস্মিন্‌কালে তার দিকে পিঠ ফেরায় নি। এদেশেও নয়, বিদেশেও নয়। বরং যে জাতির যত বেশি লোক যত বেশি বই পড়ে, সে জাতি যে তত সভ্য, এমন কথা বল্‌লে বোধ হয় অন্যায় কথা বলা হয় না। নিদ্রাকলহে দিনযাপন করার চাইতে কাব্যচর্চ্চায় কালাতিপাত করা যে প্রশংসনীয়, এমন কথা সংস্কৃতেই আছে। সংস্কৃত কবিরা সকলকেই সংসার-বিষবৃক্ষের অমৃতোপম ফল কাব্যামৃতের রসাস্বাদ করবার উপদেশ দিলেও সেকালে সে উপদেশ কেউ গ্রাহ্য কর্‌তেন কিনা, সে বিষয়ে অনেকের মনে

সন্দেহ আছে, কিছুদিন পূর্ব্বে আমারও ছিল। কেননা নিজের কলমের কালি, লেখকেরা যে অমৃত বলে চালিয়ে দিতে সদাই উৎসুক, তার পরিচয় একালেও পাওয়া যায়। কিন্তু একালেও আমরা যখন ও-সব কথায় ভুলিনে, তখন সেকালেও সম্ভবত কেউ ভুলতেন না, কেননা সেকালে সমজদারের সংখ্যা একালের চাইতে ঢের বেশি ছিল। কিন্তু আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে, হিন্দুযুগে বই পড়াটা নাগরিকদের মধ্যে একটা মস্ত বড় ফ্যাসান ছিল। এ এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, "নাগরিক" বল্‌তে সেকালে সেই শ্রেণীর জীব বোঝাত—একালে ইংরাজিতে যাকে man-about-town বলে। বাংলাভাষায় ওর কোনও নাম নেই, কেননা বাংলাদেশে ও-জাত নেই। ও-বালাই যে নেই, সেটা অবশ্য সুখের বিষয়।

(৪)

যদি অনুমতি করেন ত এই সুযোগে প্রাচীন ভারতবর্ষের নাগরিক সভ্যতার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। সেকালে এদেশে যেমন একদল ত্যাগী-পুরুষ ছিলেন, তেমনি আর একদল ভোগী-পুরুষও ছিলেন। ভারতবর্ষের আরণ্যক-ধর্ম্মের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় আমাদের সকলেরই আছে, কিন্তু তার নাগরিক ধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ আমাদের অনেকের কাছেই অবিদিত। এর ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ধারণাটা আমাদের মনে নিতান্ত একপেশো হয়ে উঠেছে। সে সভ্যতার শুধু আত্মার নয় দেহের সন্ধানটাও আমাদের নেওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ তার স্বরূপের সাক্ষাৎ আমরা পাব না। সেকালের নাগরিকদের মতিগতি রীতি-নীতির আদ্যোপান্ত বিবরণ পাওয়া যায়—কামসূত্রে। এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল অন্তত দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে, এবং এ গ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছেন ন্যায়দর্শনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার স্বয়ং বাৎস্যায়ন, অতএব কামসূত্রের বর্ণনা আমরা সত্য বলেই গ্রাহ্য করতে বাধ্য; বিশেষত ও-সূত্র যখন সংস্কৃত সাহিত্যে শাস্ত্র হিসেবেই চিরকাল গণ্য ও মান্য হয়ে এসেছে। আমি উক্ত গ্রন্থ থেকে নাগরিকদের গৃহসজ্জার আংশিক বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"বাহিরের বাসগৃহেও অতি শুভ্রচাদরপাতা একটি শয্যা থাকিবে, এবং তাহার উপর দুইটি অতি সুন্দর বালিশ রাখিতে হইবে। তাহার পার্শ্বে থাকিবে প্রতিশয্যিকা। এবং তাহার শিরোভাগে কূর্চ্চস্থান ও বেদিকা স্থাপিত করিবে। সেই বেদিকার উপর, রাত্রিশেষ অনুলেপন, মাল্য, সিকৃথকরণ্ডক, সৌগন্ধিকপূটিকা, মাতুলুঙ্গত্বক্, তাম্বুল প্রভৃতি রক্ষিত হইবে। ভূমিতে থাকিবে পতৎগ্রহ। ভিত্তিগাত্রে নাগদন্তাবসক্তা বীণা। চিত্রফলক। বর্ত্তিকা-সমুদ্গকঃ। এবং যে কোনও পুস্তক।"

উপরোক্ত বর্ণনা একটু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে—কেননা এর অনেক শব্দই বাংলাভাষায় প্রচলিত নেই। আমি কতকটা টীকা ও কতকটা অভিধানের সাহায্যে ঐ সকল অপরিচিত শব্দের বাচ্য পদার্থের যে পরিচয় লাভ করেছি, তা আপনাদের জানাচ্ছি। প্রতিশয্যিকার অর্থ ক্ষুদ্র পর্য্যঙ্ক, ভাষায় যাকে বলে খাটীয়া। এ খাটীয়া অবশ্য নাগরিকরা নিজেদের গঙ্গাযাত্রার জন্য প্রস্তুত রাখতেন না! তার মাথার গোড়ায় থাকত কূর্চ্চস্থান। কূর্চ্চ শব্দের সাক্ষাৎ আমি কোনও অভিধানে পাই নি। তবে টীকাকার বলেন, শয্যার শিরোভাগে ইষ্টদেবতার আসনের নাম কূর্চ্চ। আত্মবান নাগরিকেরা ইষ্টদেবতার স্মরণ ও প্রণাম না করে শয়নগ্রহণ করতেন না। সুতরাং কূর্চ্চ হচ্ছে একপ্রকার ব্রাকেট। সেকালের এই বিলাসী সম্প্রদায়, আমরা যাকে বলি নীতি, তার ধার এক কড়াও ধারতেন না; কিন্তু দেবতার ধার ষোল আনা ধারতেন। এ ব্যাপার অবশ্য অপূর্ব্ব নয়। একালেও দেখা যায় মানুষের প্রতি অত্যাহিত অত্যাচার করবার সময় মানুষে ইষ্টদেবতাকে ঘন ঘন স্মরণ ও প্রণাম করে। যাক্ ও সব কথা। এখন দেখা যাক্ বেদিকা বস্তুটী কি?—বেদিকাতে যত প্রকার দ্রব্য রাখবার ব্যবস্থা আছে, তাতে মনে হয় ও হচ্ছে টেবিল। এবং টীকাকারের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, এ অনুমান ভুল নয়। তিনি বলেন বেদিকা ভিত্তিসংলগ্ন, হস্তপরিমিত চতুষ্কোণ এবং কৃতকুট্টিম অর্থাৎ—inlaid. অনুলেপন দ্রব্যটি হয় চন্দন, নয় মেয়েরা যাকে বলে রূপটান, তাই। মাল্য

অবশ্য ফুলের মালা। কি ফুল তার উল্লেখ নেই, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আর যাই হোক গাঁদা নয়; কেননা তাঁরা বর্ণগন্ধের সৌকুমার্য্য বুঝতেন। সিক্থ্করণ্ডক হচ্ছে—মোমের কৌটা। সেকালে নাগরিকেরা, ঠোঁট আগে মোম দিয়ে পালিস করে নিয়ে, তারপর তাতে আল্‌তা মাখতেন। সৌগন্ধিকপুটিকা হচ্ছে—ইংরাজিতে যাবে বলে powder-box। বোতল না হয়ে বাক্স হবার কারণ, সেকালে অধিকাংশ গন্ধদ্রব্য চূর্ণ আকারেই ব্যবহৃত হত। দেয়াল ছেড়ে ঘরের মেজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে—প্রথমেই চোখে পড়ে পতৎগ্রহ, অর্থাৎ—পিকদানী। তারপর চোখ তুললে নজরে পড়ে, ভিত্তি-সংলগ্ন হস্তিদন্তে বিলম্বিত বীণা। টিকাকার বলেন সে বীণা আবার "নিচোল-অবগুণ্ঠিতা"। বাংলার অনেক পদ্যলেখকদের ধারণা নিচোল অর্থে শাড়ী। "শাড়ীপরা বীণা"র অবশ্য কোনও মানে নেই। নিচোল অর্থে গেলাপ। জয়দেব যে শ্রীরাধিকাকে বলেছিলেন "শীলয় নীল নিচোলং" তার অর্থ "নীলরঙের একটি ঘেরাটোপ পর"। ইংরাজি ভাষায় ওর তর্জ্জমা হচ্ছে—Put on a dark blue cloak. এখন আবার প্রকৃত প্রস্তাবে ফিরে আসা যাক্। তারপর পাই চিত্রফলক। সংস্কৃত কাব্যের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়, পুরাকালে ছবি কাঠের উপরে আঁকা হত, কাপড়ের উপরে নয়। বর্ত্তিকা সমুদ্গকের অর্থ তুলি ও রঙ রাখবার বাক্স। তারপর বই।

নাগরিকদের গৃহের এবং দেহের এই সাজসজ্জার বর্ণনা থেকেই বুঝতে পারবেন তাঁরা কি চরিত্রের লোক ছিলেন। তারপর প্রশ্ন ওঠে, বই নিয়ে এ প্রকৃতির লোকেরা কি করতেন? কেন না নাগরিকেরা আর যাই হ'ন, তাঁরা যে সব উদাসীন গ্রন্থকীট ছিলেন না, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। পুস্তক কি তবে এঁদের গৃহসজ্জার জন্য রক্ষিত হত, যেমন আজকাল কোন কোন ধনীলোকের গৃহে হয়? এ সন্দেহ দৃঢ় হয়ে আসে, যখন টীকাকারের মুখে শুনতে পাই যে—

"এই সকল বীণাদিদ্রব্য সর্ব্বদা উপঘাতের, অর্থাৎ—ব্যবহার করিয়া নষ্ট

করিবার জন্য নহে। কেবল বাসগৃহের শোভা সম্পাদনার্থ ভিত্তি নিহিত হস্তিদন্তে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। কালে ভদ্রে কখনো প্রয়োজন হইলে তাহা সেখান হইতে নামাইতে হবে।"

পূর্ব্বোক্ত সন্দেহের আরও কারণ আছে। সূত্রকার যখন বলেছেন—যঃ কশ্চিৎ পুস্তকং, অর্থাৎ—"যা হোক একটা বই",—তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সে বই, আর যে কারণেই হো'ক, পড়বার জন্য রাখা হত না। কিন্তু টিকাকার আমাদের এ সন্দেহ ভঞ্জন করেছেন। তাঁর কথা এই:—'যঃ কশ্চিৎ' এটি সামান্য নির্দ্দেশ হইলেও, তখনকার যে-কোনও কাব্য তাহাই পড়িবার জন্য রাখিবে, ইহাই যে সূত্রকারের উপদেশ, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।"

টীকাকারের এ সিদ্ধান্ত আমি গ্রাহ্য করি। বীণা ও পুস্তক দুই সরস্বতীর দান হলেও, ও-দুই গ্রহণ করবার সমান শক্তি এক দেহে প্রায় থাকে না। বীণাবাদন বিশেষ সাধনাসাধ্য, পুস্তকপঠন অপেক্ষাকৃত ঢের সহজ। সুতরাং বই পড়ার অধিকার যত লোকের আছে, বীণা বাজাবার অধিকার তার সিকির সিকি লোকেরও নেই। এই কারণে সকলকে জোর করে বিদ্যাশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা এ যুগের সকল সভ্য দেশেই আছে; কিন্তু কাউকে জোর করে সঙ্গীত-শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কোনও অসভ্য দেশেও নেই। অতএব নাগরিকেরা বীণা দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখ্‌তেন বলে যে পুঁথির ডুরি খুলতেন না, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হবে। সে যাই হে'াক, টীকাকার বলেছেন "যে-সে বই নয়, তখনকার বই"; এই উক্তিই প্রমাণ যে, সে বই পড়া হত। যে বই এখনকার নয় কিন্তু সেকালের, যাকে ইংরাজিতে বলে classic, তা ভদ্রসমাজে অনেক লোক ঘরে রাখে পড়বার জন্য নয়, দেখবার জন্য। কিন্তু হালের বই লোকে পড়বার জন্যই সংগ্রহ করে, কেননা অপর কোনও উদ্দেশ্যে তা গৃহজাত করবার কোনরূপ সামাজিক দায় নেই। আর এক কথা। আমরা বর্ত্তমান ইউরোপের সভ্য সমাজেও দেখ্‌তে পাই যে, "এখনকার" বই পড়া সে সমাজের সভ্যদের ফ্যাসানের একটি প্রধান অঙ্গ। Anatole France-এর টাট্‌কা বই পড়ি নি,

এ কথা বল্‌তে প্যারিসের নাগরিকেরা যাদৃশ লজ্জিত হবেন, সম্ভবত Kipling-এর কোনও সদ্যপ্রসূত বই পড়ি নি বল্‌তে লণ্ডনের নাগরিকেরাও তাদৃশ লজ্জিত হবেন ; যদিচ Anatole France-এর লেখা যেমন সুপাঠ্য, Kipling-এর লেখা তেমনি অপাঠ্য। এ কথা আমি আন্দাজে বল্‌ছিনে। বিলেতে একটি ব্যারিষ্টারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। জনরব তিনি মাসে দশ বিশ হাজার টাকা রোজগার করতেন। অত না হো'ক্, যা রটে তা কিছু বটেই ত। এই থেকেই আপনারা অনুমান করতে পারেন তিনি ছিলেন কত বড় লোক। এত বড় লোক হয়েও তিনি একদিন আমার কাছে, Oscar Wilde-এর বই পড়েন নি, এই কথাটা স্বীকার করতে এতটা মুখ কাঁচুমাচু করতে লাগলেন, যতটা চোরডাকাতরাও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে guilty plead করতে সচরাচর করে না। অথচ তাঁর অপরাধটা কি ?—Oscar Wilde-এর বই পড়েন নি, এই ত ! ও সব বই পড়েছি স্বীকার করতে আমরা লজ্জিত হই। শেষটা তিনি এর জন্য আমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে সুরু করলেন। তিনি বল্‌লেন যে, আইনের অশেষ নজির উদরস্থ করতেই তাঁর দিন কেটে গিয়েছে, সাহিত্য পড়্‌বার তিনি অবসর পান নি। বলা বাহুল্য এ রকম ব্যক্তিকে এদেশে আমরা একসঙ্গে রাজনীতির নেতা এবং সাহিত্যের শাসক করে তুলতুম। কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই, এ কথা কবুল করতে তিনি যে এতটা লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন তার কারণ, তাঁর এ জ্ঞান ছিল যে তিনি যত আইনজ্ঞই হোন, আর যত টাকাই করুন, তাঁর দেশে ভদ্রসমাজে কেউ তাঁকে বিদগ্ধজন বলে মান্য করবে না।

সংস্কৃত বিদগ্ধ শব্দের প্রতিশব্দ cultured ! বাৎস্যায়ন যাকে নাগরিক বলেন, টীকাকার তাঁকে বিদগ্ধ নামে অভিহিত করেন। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, এদেশে পূরাকালে culture জিনিসটা ছিল নাগরিকতার একটা প্রধান গুণ। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, একালে আমরা যাকে সভ্য বলি, সেকালে তাকে নাগরিক বল্‌ত। অপরপক্ষে সংস্কৃত

ভাষায় গ্রাম্যতা এবং অসভ্যতা পর্য্যায়-শব্দ—ইংরাজিতে যাকে বলে synonyms.

(৫)

এর উত্তরে হয়ত অনেকে এই কথা বলবেন যে, সেকালে বই পড়াটা ছিল বিলাসের একটা অঙ্গ। বাৎস্যায়নই যখন আমার প্রধান সাক্ষী, তখন এ অভিযোগের প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে কঠিন। এ যুগে অবশ্য আমরা সাহিত্যচর্চ্চাটা বিলাসের অঙ্গ বলে মনে করি নে, ও চর্চ্চা থেকে আমরা ঐহিক এবং পারত্রিক নানারূপ সুফললাভের প্রত্যাশা রাখি। আপনারা সকলেই জানেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যে "মাল্য চন্দন নিতা" এ তিন একসঙ্গেই যায়, এবং ও তিনই ছিল এক পর্য্যায়ভুক্ত। কিন্তু আমাদের কাছে মাল্যচন্দনের সামিল, বনিতাও নয়, কবিতাও নয়। কাজেই আমাদের চোখে সেকালের নাগরিক সমাজের রীতিনীতি অবশ্য দৃষ্টিকটু ঠেকে। কেননা আমাদের চোখের পিছনে আছে আমাদের মন, এবং আমাদের মনের পিছনে আছে আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক বুদ্ধি। এই কারণেই প্রাচীন সমাজের প্রতি সুবিচার করতে হ'লে, সে সমাজকে ঐতিহাসিকের চোখ দিয়ে দেখা কর্ত্তব্য। তাই আমি উদাসীন গ্রন্থকীট হিসেবে নাগরিকদের উক্তরূপ সাহিত্যচর্চ্চার ফলাফল একটুখানি আলোচনা করে দেখতে চাই। বলা বাহুল্য ঐতিহাসিক হতে হলে প্রথমত বর্ত্তমানের প্রতি উদাসীন হওয়া চাই, দ্বিতীয়ত প্রাচীন গ্রন্থের কীট হওয়া চাই। আরও অনেক হওয়া চাই, কিন্তু ও দুটি না হলে নয়।

যে সমাজে কাব্যচর্চ্চা হচ্ছে বিলাসের একটি অঙ্গ, সে সমাজ যে সভ্য—এই হচ্ছে আমার প্রথম বক্তব্য। যা মনের বস্তু তা উপভোগ করবার ক্ষমতা বর্ব্বর জাতির মধ্যে নেই, ভোগ অর্থে তারা বোঝে কেবলমাত্র দৈহিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা। ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি পশুরাও করে, এবং তা ছাড়া আর কিছু করে না। অপরপক্ষে যে সমাজের আয়েসীর দলও কাব্যকলার আদর করে, সে সমাজ সভ্যতার অনেক সিঁড়ি ভেঙ্গেছে। সভ্যতা জিনিসটে

কি? এ প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করলে দু' কথায় তার উত্তর দেওয়া শক্ত। কেননা যুগভেদে ও দেশভেদে পৃথিবীতে সভ্যতা নানা-মূর্ত্তি ধারণ করে দেখা দিয়েছে, এবং কোন সভ্যতাই একেবারে নিরাবিল নয়; সকল সভ্যতার ভিতরই যথেষ্ট পাপ ও যথেষ্ট পাঁক আছে। নীতির দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে সভ্যতা ও অসভ্যতার প্রভেদ যে আকাশপাতাল, এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় না। তবে মানুষের কৃতিত্বের মাপে যাচাই করতে গেলে, দেখতে পাওয়া যায় যে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে কাব্যকলায় শিল্পে বাণিজ্যে সভ্যজাতি ও অসভ্যজাতির মধ্যে সাত সমুদ্র তের নদীর ব্যবধান। জনৈক ফরাসী লেখক বলেছেন যে, যিনিই মানবের ইতিহাস চর্চ্চা করেছেন, তিনিই জানেন যে মানুষকে ভাল করবার চেষ্টা বৃথা। এ হচ্ছে অবশ্য ক্ষুব্ধ মনের ক্রুদ্ধ কথা, অতএব বেদবাক্য হিসেবে গ্রাহ্য নয়। সে যাই হো'ক, এ কথার উত্তরে আমি বলি যে মানুষকে ভাল না করা যাক্, ভদ্র করা যায়। পৃথিবীতে সুনীতির চাইতে সুরুচি কিছু কম দুর্ল্লভ পদার্থ নয়। পুরাকালে সাহিত্যের চর্চ্চা মানুষকে নীতিমান না করলেও রুচিমান করত। সমাজের পক্ষে এও একটা কম লাভ নয়।

ধরে নেওয়া যাক সেকালের নাগরিক সমাজ কাব্যকে মনের বেশভূষার উপকরণ হিসেবে দেখ্‌ত। তাঁরা যে হিসাবে ওষ্ঠে যাবক ধারণ করতেন সেই হিসাবেই কণ্ঠে শ্লোক ধারণ করতেন। এ অনুমান নিতান্ত অমূলক নয়। সংস্কৃত ভাষায় একটি নাতিহ্রস্ব শ্লোকসংগ্রহ আছে, যার নাম "বিদগ্ধ-মুখ-মণ্ডনম্"। ওরকম নামকরণের ফলে কাব্য অবশ্য রঙের কোঠায় পড়ে যায়। সে যাই হোক্, নাগরিকদের বই পড়া যে একেবারে ভস্মে ঘি ঢালার সামিল ছিল না, এবং তাঁদের বৈদগ্ধ্য যে তাঁদের মনুষ্যত্ব অনেকটা রক্ষা করেছিল, একটি উদাহরণের সাহায্যে তার প্রমাণ দিচ্ছি। চরিত্রহীন অথচ কলাকুশল নাগরিকদের সেকালে সাধারণ সংজ্ঞা ছিল "বিট"। এই বিটের একটি ছবি আমরা মৃচ্ছকটিকে দেখ্‌তে পাই। ঐ নাটকের রাজশ্যালক শকারের সঙ্গে বিটের তুলনা করলেই নিরক্ষর ও বিদগ্ধ জনের প্রকৃতির তারতম্য স্পষ্ট দেখ্‌তে

পাওয়া যায়। উভয়েই সমান বিলাস-ভক্ত, কিন্তু শকার পশু আর বিট সুজন। শকারের ব্যবহার দেখ্‌লে ও কথা শুনলে তাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিতে হাত নিসপিস করে, অপরপক্ষে বিটের ব্যবহারের সৌজন্য, ভাষার আভিজাত্য, মনের সরসতা এত বেশি যে, তাঁকে সাদর সম্ভাষণ করে' ঘরে এনে বসাতে ইচ্ছে যায়—দু'দণ্ড আলাপ কর্‌বার জন্য। বৈদগ্ধ্য যে একটি সামাজিক গুণ, এ কথা অস্বীকার করায় সত্যের অপলাপ করা হবে। মার্জ্জিত রুচি, পরিষ্কৃত বুদ্ধি, সংযত ভাষা ও বিনীত ব্যবহার মানুষকে চিরকাল মুগ্ধ করে এসেছে এবং সম্ভবত চিরকাল করবে। এ সকল বস্তু সমাজকে উন্নত না হোক্ অলঙ্কৃত করে। এবং এ সকল গুণ কাব্য ও কলার চর্চ্চা ব্যতীত রক্তমাংসের শরীরে আপনা হতে ফুটে ওঠে না। তবে এ কথা ঠিক যে, প্রাচীন সভ্যতা এ সকল গুণের যতটা মূল্য দিত, আমরা ততটা দিই নে। তার কারণ সে কালের সভ্যতা ছিল aristocratic, আর এ কালের সভ্যতা হতে চাচ্ছে democratic. সেকালে তাঁরা চাইতেন আকার,—আমরা চাই বস্তু। তাঁরা দেখ্‌তেন মানুষের ব্যবহার, আমরা দেখ্‌তে চাই তার ভিতরটা। তাঁরা ছিলেন রূপভক্ত, আমরা গুণলুব্ধ। ক্লাসিক সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের তুলনা কর্‌লে এ প্রভেদ সকলেরি চোখে ধরা পড়্‌বে। এ যুগের সাহিত্যমাত্রেই রোমান্টিক, অর্থাৎ—তাতে আর্টের ভাগ কম এবং আত্মার ভাগ বেশি। এর কারণ, এ যুগের কবিরা কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেন। এ যুগের কবি জনগণের প্রতিনিধিও নন মুখপাত্রও নন, সুতরাং সে কবির মন নিজের মন, লৌকিক মনও নয়, সামাজিক মনও নয়। আর সেকালের কবিরা সামাজিকদের মনোরঞ্জন কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তেন। সেকালের সামাজিকেরা কলাবিৎ ছিলেন বলে, সেকালের কবিরা রচনায় বস্তুর অপেক্ষা তার আকারের দিকেই বেশি মনোযোগ দিতে বাধ্য হতেন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে দেখ্‌তে পাই, কবি কি বল্‌লেন, তার চাইতে কি ভাবে বল্‌লেন তার মর্য্যাদা ঢের বেশি। সুতরাং নাগরিকদের কাব্যচর্চ্চার ফলে প্রাচীন সাহিত্য যে আর্টিষ্টিক হয়েছে, এ কথা নির্ভয়ে বলা

যেতে পারে। এই সব কারণে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে নাগরিকদের কাব্যচর্চ্চা একেবারে নিষ্ফল হয় নি, কেন না তার গুণে ক্লাসিক সাহিত্য অসামান্য সুষমা ও সামঞ্জস্য লাভ করেছে।

কাব্যে আর্টের মূল্য যে কত বড়, সে আলোচনায় আজ প্রবৃত্ত হব না, কেন না সে আলোচনা দু' কথায় শেষ করবার জো নেই। বহু যুক্তি বহু তর্কের সাহায্যে ও সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেন না আমি পূর্ব্বেই বলেছি এ যুগের ডিমোক্রাটিক আত্মা আর্টকে উপেক্ষা করে, অবজ্ঞা করে, সম্ভবত মনে মনে হিংসাও করে,—বোধ হয় এই কারণে যে, আর্টের গায়ে আভিজাত্যের ছাপ চিরস্থায়িরূপে বিরাজ করে। অথচ ডিমোক্রাসির এ সত্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, লৌকিক মন বস্তুগত বলেই তা materialism-এর দিকে সহজেই ঝোঁকে। এ বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আর্টের চর্চ্চা আবশ্যক।

(৬)

বই পড়ার সখটা মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সখ হলেও, আমি কাউকে সখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চাই নে। প্রথমত সে পরামর্শ কেউ গ্রাহ্য করবেন না, কেননা আমরা জাত হিসেবে সৌখীন নই, দ্বিতীয়ত অনেকে তা কুপরামর্শ মনে করবেন, কেননা আমাদের এখন ঠিক সখ করবার সময় নয়। আমাদের এই রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্যের দেশে জীবন ধারণ করাই যখন হয়েছে প্রধান সমস্যা, তখন সে জীবনকে সুন্দর করা মহৎ করার প্রস্তাব, অনেকের কাছেই নিরর্থক এবং সম্ভবত নির্ম্মমও ঠেকবে। আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে আজ প্রস্তুত নই; কিন্তু শিক্ষার ফললাভের জন্য আমরা সকলেই উদ্বাহু। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই দূর করবে। এ আশা সম্ভবত নয়ই—দুরাশা; কিন্তু তাহলেও আমরা তা ত্যাগ করতে পারিনে, কেননা আমাদের উদ্ধারের অন্য কোনও সদুপায় আমরা চোখের সুমুখে দেখতে পাই নে। শিক্ষার মাহাত্ম্যে আমিও বিশ্বাস করি, এবং যিনিই যা বলুন সাহিত্যচর্চ্চা যে শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ, সে বিষয়ে

কোনও সন্দেহ নেই। লোকে যে তা সন্দেহ করে, তার কারণ এ শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ—তার কোনও নগদ বাজারদর নেই। এই কারণেই ডিমোক্রাসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না, বোঝে শুধু অর্থের সার্থকতা। ডিমোক্রাসির গুরুরা চেয়েছিলেন সকলকে সমান করতে, কিন্তু তাঁদের শিষ্যেরা তাঁদের কথা উল্টো বুঝে প্রতিজনেই হতে চায় বড়মানুষ। একটি বিশিষ্ট অভিজাত সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও, ইংরাজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমরা ডিমোক্রাসির গুণগুলি আয়ত্ত করতে না পারি, তার দোষগুলি আত্মসাৎ করেছি। এর কারণও স্পষ্ট। ব্যাধিই সংক্রামক,—স্বাস্থ্য নয়। আমাদের শিক্ষিত সমাজের লোলুপ দৃষ্টি আজ অর্থের উপরেই পড়ে রয়েছে, সুতরাং সাহিত্যচর্চ্চার সুফল সম্বন্ধে আমরা অনেকেই সন্দিহান! যাঁরা হাজারখানা Law-report কেনেন, তাঁরা একখানা কাব্যগ্রন্থও কিনতে প্রস্তুত নন, কেননা তাতে ব্যবসার কোনও সুসার নেই। নজির না আউড়ে কবিতা আবৃত্তি করলে মামলা যে দাঁড়িয়ে হারতে হবে, সেত জানা কথা। কিন্তু যে কথা জজে শোনে না, তার যে কোনও মূল্য নেই, এইটেই হচ্ছে পেশাদারদের মহাভ্রান্তি। জ্ঞানের ভাণ্ডার যে ধনের ভাণ্ডার নয়, এ সত্য ত প্রত্যক্ষ, কিন্তু সমান প্রত্যক্ষ না হলেও এও সমান সত্য নয় যে, এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য, সে জাতির ধনের ভাঁড়েও ভবানী। তারপর যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়; কেননা ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞানসাপেক্ষ, তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টিও মনসাপেক্ষ। এবং মানুষের মনকে সবল সচল সরাগ ও সমৃদ্ধ করবার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের উপর ন্যস্ত হয়েছে। কেননা মানুষের দর্শন-বিজ্ঞান ধর্ম্ম-নীতি অনুরাগ-বিরাগ আশা-নৈরাশ্য, তার অন্তরের স্বপ্ন ও সত্য—এই সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম। অপরাপর শাস্ত্রের ভিতর যা আছে, সে সব হচ্ছে মানুষের মনের ভগ্নাংশ; তার পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে। দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি সব হচ্ছে মন-গঙ্গার তোলা জল, তার পূর্ণ স্রোত আবহমান কাল সাহিত্যের ভিতরই সোল্লাসে

সবেগে বয়ে চলেছে ; এবং সেই গঙ্গাতে অবগাহন করেই আমরা আমাদের সকল পাপ হতে মুক্ত হব।

অতএব দাঁড়াল এই যে, আমাদের বই পড়তেই হবে, কেন না বইপড়া ছাড়া সাহিত্যচর্চ্চার উপায়ান্তর নেই। ধর্ম্মের চর্চ্চা চাই কি মন্দিরের বাইরেও করা চলে, দর্শনের চর্চ্চা গুহায়, নীতির চর্চ্চা ঘরে, এবং বিজ্ঞানের চর্চ্চা যাদুঘরে ; কিন্তু সাহিত্যের চর্চ্চার জন্য চাই লাইব্রেরি। ও চর্চ্চা মানুষে কারখানাতেও করতে পারে না, চিড়িয়াখানাতেও নয়।

এ সব কথা যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের মানতেই হবে যে, লাইব্রেরির মধ্যেই আমাদের জাত মানুষ হবে। সেই জন্য আমরা যত বেশি লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে।

আমার মনে হয় এদেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাঁসপাতালের চাইতে কিছু কম নয়, এবং স্কুলকলেজের চাইতে কিছু বেশি। এ কথা শুনে অনেকে চম্‌কে উঠবেন, কেউ কেউ আবার হেসেও উঠবেন। কিন্তু আমি জানি আমি রসিকতাও করছি নে, অদ্ভুত কথাও বল্‌ছি নে ; যদিচ এ বিষয়ে লোকমত যে আমার মতের সমরেখায় চলে না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। অতএব আমার কথার আমি কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। আমার বক্তব্য আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, তার সত্যমিথ্যার বিচার আপনারা করবেন। সে বিচারে আমার কথা যদি না টেঁকে, তাহলে তা রসিকতা হিসেবেই গ্রাহ্য করবেন।

আমার বিশ্বাস শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রেই স্ব-শিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যার দাতার অভাব নেই, এমন কি এক্ষেত্রে দাতাকর্ণেরও অভাব নেই ; এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাঁদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিন্ত থাকি, এই বিশ্বাসে যে, সেখান থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে, যার সুদে তারা বাকী জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যেও দান

গ্রহণসাপেক্ষ, অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহীতার কথাটা একেবারে ভুলে যাই। এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতুম যে, শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষা দান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জ্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্য্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, তার জ্ঞান-পিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন—এর বেশি আর কিছু পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে সে নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমত বিদ্যা নিজে অর্জ্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়। গুরু উত্তরসাধক মাত্র।

আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উল্টো। সেখানে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়, তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। একটা জানাশোনা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক্। আমাদের সমাজে এমন অনেক মা আছেন, যাঁরা শিশুসন্তানকে ক্রমান্বয়ে গরুর দুধ গেলানোটাই শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার ও বলবৃদ্ধির সর্ব্বপ্রধান উপায় মনে করেন। গোদুগ্ধ অবশ্য অতিশয় উপাদেয় পদার্থ, কিন্তু তার উপকারিতা যে ভোক্তার জীর্ণ করবার শক্তির উপর নির্ভর করে, এ জ্ঞান ও-শ্রেণীর মাতৃকুলের নেই। তাঁদের বিশ্বাস ও-বস্তু পেটে গেলেই উপকার হবে। কাজেই শিশু যদি তা গিলতে আপত্তি করে, তাহলে সে যে ব্যাদড়া ছেলে, সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। অতএব তখন তাকে ধরে বেঁধে জোর জবরদস্তি দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। শেষটা সে যখন এই দুগ্ধপান ক্রিয়া হতে অব্যাহতি লাভ করবার জন্য মাথা নাড়তে, হাত-পা ছুঁড়তে সুরু করে, তখন স্নেহময়ী মাতা বলেন "আমার মাথা খাও, মরামুখ দেখো, এই ঢোক, আর এক ঢোক, আর এক ঢোক" ইত্যাদি। মাতার উদ্দেশ্য যে খুব সাধু, সে

বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই; কিন্তু এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, উক্ত বলা কওয়ার ফলে মা শুধু ছেলের যকৃতের মাথা খান, এবং ঢোকের পর ঢোকে তার মরামুখ দেখবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে চলেন। আমাদের স্কুলকলেজের শিক্ষা-পদ্ধতিটাও ঐ একই ধরণের। এর ফলে কত ছেলের সুস্থ সবল মন যে infantile liver-এ গতাসু হচ্ছে, তা বলা কঠিন। কেননা দেহের মৃত্যুর রেজিষ্টারি রাখা হয়, আত্মার মৃত্যুর হয় না।

(৭)

আমরা কিন্তু এই আত্মার অপমৃত্যুতে ভীত হওয়া দূরে থাক্, উৎফুল্ল হয়ে উঠি। আমরা ভাবি দেশে যত ছেলে পাস হচ্ছে তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে; পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া যে একবস্তু নয়, এ সত্য স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই। শিক্ষাশাস্ত্রের একজন জগদ্বিখ্যাত ফরাসী শাস্ত্রী বলেছেন যে, এক সময়ে ফরাসীদেশে শিক্ষা-পদ্ধতি এতই বেয়াড়া ছিল যে, সে যুগে France was saved by her idlers; অর্থাৎ—যারা পাস করতে পারে নি, কিম্বা চায় নি, তারাই ফ্রান্সকে রক্ষা করেছে। এর কারণ, হয় তাদের মনের বল ছিল বলে কলেজের শিক্ষা তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল; নয় সে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছিল বলেই তাদের মনের বল বজায় ছিল। তাই এই স্কুল-পালানো ছেলেদের দল থেকে, সে যুগের ফ্রান্সের যত কৃতকর্ম্মা লোকের আবির্ভাব হয়েছিল।

সে যুগে ফ্রান্সে কিরকম শিক্ষা দেওয়া হত তা আমার জানা নেই, তবুও আমি জোর করে বলতে পারি যে, এ যুগে আমাদের স্কুলকলেজে শিক্ষার যে রীতি চল্ছে, তার চাইতে সে শিক্ষাপদ্ধতি কখনই নিকৃষ্ট ছিল না। সকলেই জানেন যে, বিদ্যালয়ে মাষ্টার মহাশয়েরা নোট দেন, এবং সেই নোট মুখস্থ করে ছেলেরা হয় পাস। এর জুড়ি আর একটি ব্যাপারও আমাদের দেশে দেখা যায়। এদেশে একদল বাজিকর আছে, যারা বন্দুকের গুলি থেকে আরম্ভ করে উত্তরোত্তর কামানের গোলা পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করে। তারপর

একে একে সবগুলি উগ্‌লে দেয়। এর ভিতর যে অসাধারণ কৌশল আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই গেলা আর ওগ্‌লানো দর্শকের কাছে তামাসা হলেও—বাজিকরের কাছে তা প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ ব্যাপার। ও-কারদানি করা তার পক্ষে যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি অপকারী। বলা বাহুল্য, সে বেচারা ঐ লোহার গোলা-গুলির এক কণাও জীর্ণ কর্‌তে পারে না। আমাদের ছেলেরাও তেমনি নোটনামক গুরুদত্ত নানা আকারের ও নানা প্রকারের গোলা-গুলি বিদ্যালয়ে গলাধঃকরণ করে পরীক্ষালয়ে তা উদ্গীরণ করে দেয়। এর জন্য সমাজ তাদের বাহ্‌বা দেয় দিক্‌, কিন্তু মনে যেন না ভাবে যে এতে জাতির প্রাণশক্তি বাড়্‌ছে। স্কুলকলেজের শিক্ষা যে অনেকাংশে ব্যর্থ, সে বিষয়ে প্রায় অধিকাংশ লোকই একমত। আমি বলি শুধু ব্যর্থ নয়, অনেক স্থলে মারাত্মক; কেননা আমাদের স্কুলকলেজ ছেলেদের স্ব-শিক্ষিত হবার যে সুযোগ দেয় না, শুধু তাই নয়—স্ব-শিক্ষিত হবার শক্তি পর্য্যন্ত নষ্ট করে। আমাদের শিক্ষা-যন্ত্রের মধ্যে যে যুবক নিষ্পেষিত হয়ে বেরিয়ে আসে—তার আপনার বল্‌তে আর বেশি কিছু থাকে না, যদি না তার প্রাণ অত্যন্ত কড়া হয়। সৌভাগ্যের বিষয় এই ক্ষীণপ্রাণ জাতির মধ্যেও জনকতক এমন কঠিন প্রাণের লোক আছে, এহেন শিক্ষা পদ্ধতিও যাদের মনকে জখম কর্‌লেও একেবারে বধ কর্‌তে পারে না।

আমি লাইব্রেরিকে ইস্কুলকলেজের উপরে স্থান দেই এই কারণে যে, এ স্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে স্ব-শিক্ষিত হবার সুযোগ পায়; প্রতি লোক তার স্বীয়শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্কুলকলেজ বর্ত্তমানে আমাদের যে অপকার কর্‌ছে, সে অপকারের প্রতিকারের জন্য শুধু নগরে নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, লাইব্রেরি হাঁসপাতালের চাইতে কম উপকারী নয়; তার কারণ আমাদের শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে একরকম মনের হাঁসপাতাল।

(৮)

অতঃপর আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, "বই পড়ার পক্ষ নিয়ে এ ওকালতি করবার, বিশেষত প্রাচীন নজির দেখাবার কি প্রয়োজন ছিল? বই পড়া যে ভাল, তা কে না মানে?" আমার উত্তর—সকলে মুখে মানলেও, কাজে মানে না। মুসলমান ধর্ম্মে মানব জাতি দুই ভাগে বিভক্ত—এক যারা কেতাবি, আরেক যারা তা নয়। বাংলার শিক্ষিত সমাজ যে পূর্ব্বদলভুক্ত নয়, এ কথা নির্ভয়ে বলা যায়। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় যোটের উপর বাধ্য না হলে বই স্পর্শ করেন না। (ছেলেরা যে নোট পড়ে এবং ছেলের বাপেরা যে নজির পড়েন, সে দুই-ই বাধ্য হয়ে, অর্থাৎ—পেটের দায়ে। সেই জন্য সাহিত্যচর্চ্চা দেশে একরকম নেই বললেই হয়, কেননা সাহিত্য সাক্ষাৎ-ভাবে উদরপূর্ত্তির কাজে লাগে না। বাধ্য হয়ে বই পড়ায় আমরা এতটা অভ্যস্ত হয়েছি যে, কেউ স্বেচ্ছায় বই পড়লে আমরা তাকে নিষ্কর্ম্মার দলেই ফেলে দিই। অথচ একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, যে জিনিস স্বেচ্ছায় না করা যায়, তাতে মানুষের মনের সন্তোষ নেই। একমাত্র উদর-পূর্ত্তিতে মানুষের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি হয় না। একথা আমরা সকলেই জানি যে, উদরের দাবী রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচে না; কিন্তু একথা আমরা সকলে মানি নে যে, মনের দাবী রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না। দেহরক্ষা অবশ্য সকলেরি কর্ত্তব্য, কিন্তু আত্মরক্ষাও অকর্ত্তব্য নয়। মানবের ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে যে, মানুষের প্রাণ, মনের সম্পর্ক যত হারায়, ততই তা দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। মনকে সজাগ ও সবল রাখতে না পারলে, জাতির প্রাণ যথার্থ স্ফূর্ত্তিলাভ করে না। তারপর যে জাতি যত নিরানন্দ, সে জাতি তত নির্জ্জীব।) একমাত্র আনন্দের স্পর্শেই মানুষের মনপ্রাণ সজীব সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে। সুতরাং সাহিত্যচর্চ্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে জাতির জীবনীশক্তির হ্রাস করা, অতএব কোনও নীতির অনুসারেই তা কর্ত্তব্য হতে পারে না,—অর্থনীতিরও নয় ধর্ম্মনীতিরও নয়।

কাব্যামৃতে যে আমাদের অরুচি ধরেছে, সে অবশ্য আমাদের দোষ নয়,—আমাদের শিক্ষার দোষ। যার আনন্দ নেই সে নির্জ্জীব, একথা যেমন সত্য; যে নির্জ্জীব তারও যে আনন্দ নেই, সে কথাও তেমনি সত্য। আমাদের শিক্ষাই আমাদের নির্জ্জীব করেছে। জাতীয় আত্মরক্ষার জন্য এ শিক্ষার উল্টো টান যে আমাদের টান্‌তে হবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই বিশ্বাসের বলেই আমি স্বেচ্ছায় সাহিত্যচর্চ্চার স্বপক্ষে এত বাক্যব্যয় করলুম। সে বাক্যে আপনাদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছি কিনা জানিনে। সম্ভবত হই নি; কেননা আমাদের দুরবস্থার কথা যখন স্মরণ করি, তখন খালি কোমল স্বরে আলাপ করা আর চলে না; মনের আক্ষেপ প্রকাশ করতে মাঝে মাঝেই কড়ি লাগাতে হয়।

আপনাদের কাছে আমার আর একটি নিবেদন আছে। এ প্রবন্ধে প্রাচীন যুগের নাগরিক সভ্যতার উল্লেখটা, কতকটা ধান ভান্‌তে শিবের গীত গাওয়া হয়েছে। এ কাজ আমি বিদ্যে দেখাবার জন্য করি নি, পুঁথি বাড়াবার জন্যও করি নি। এই ডিমোক্রাটিক যুগে aristocratic সভ্যতার স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। আমার মতে এ যুগের বাঙালীর আদর্শ হওয়া উচিত প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা, কেন না এ উচ্চ আশা অথবা দুরাশা আমি গোপনে মনে পোষণ করি যে, প্রাচীন ইউরোপে Athens যে স্থান অধিকার করেছিল, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে বাংলা সেই স্থান অধিকার করবে। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে, তা ছিল একধারে democratic এবং aristocratic; অর্থাৎ—সে সভ্যতা ছিল সামাজিক জীবনে democratic, এবং মানসিক জীবনে aristocratic, সেই কারণেই গ্রীক সাহিত্য এত অপূর্ব্ব, এত অমূল্য। সে সাহিত্যে আত্মার সঙ্গে আর্টের কোনও বিচ্ছেদ নেই, বরং দু'য়ের মিলন এত ঘনিষ্ঠ যে, বুদ্ধিবলে তা বিশ্লিষ্ট করা কঠিন। আমাদের কর্ম্মীর দল যেমন একদিকে বাংলায় ডিমোক্রাসী গড়ে তুল্‌তে চেষ্টা করেছেন, তেমনি আর একদিকে আমাদেরও পক্ষে মনের aristocracy গড়ে তোলবার

চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এর জন্য চাই সকলের পক্ষে কাব্য-কলার চর্চ্চা। গুণী ও গুণজ্ঞ উভয়ের মনের মিলন না হলে, কাব্য-কলার আভিজাত্য রক্ষা করা অসম্ভব। সাহিত্য-চর্চ্চা করে দেশসুদ্ধ লোক গুণজ্ঞ হয়ে উঠুক—এই হচ্ছে দেশের লোকের কাছে আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা।

শ্রাবণ, ১৩২৫। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

আমাদের শিক্ষা ও বর্ত্তমান জীবনসমস্যা।*

এ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদের অনুরোধে আজ এ ক্ষেত্রে যে বিষয়ের আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, সে বিষয়ের আমি ব্যবসায়ী নই। ছেলে-পড়ানো এবং স্কুল-চালানো সম্বন্ধে আমার কোনরূপ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই। প্রথমত আমি কখনও স্কুলমাষ্টারি করি নি; তার পর আমি নিজে নিঃসন্তান, সুতরাং ঘরেও কোন ছেলের শিক্ষার ভার আমাকে নিজের হাতে নিতে হয় নি; এবং অবস্থার কৃপায় পরের ছেলেরও প্রাইভেট-টিউটরি আমাকে কস্মিন্‌কালে করতে হয় নি। এ সব কারণে যদি কেউ বলেন যে, শিক্ষা সম্বন্ধে আমার পক্ষে কথা কওয়া সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চ্চা, তার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, অনেক সময়ে দর্শকের চোখে অনেক জিনিস ধরা পড়ে, যা যাঁরা কোনও বিশেষ কর্ম্মে একান্ত ব্যাপৃত থাকেন তাঁদের চোখ এড়িয়ে যায়। এ সত্যের পরিচয় দাবা খেলায় নিত্যই পাওয়া যায়। পাকা খেলোয়াড়েরাও আনাড়ির উপরচাল অনেক সময়ে গ্রাহ্য করেন। আমি শিক্ষা বিষয়ে পরের ছেলের উপর কখনো কোনও experiment করি নি; কিন্তু বহুকাল থেকে মনোযোগ সহকারে সে experiment-এর পদ্ধতি এবং ফলাফল observe করে আসছি। সেই নির্লিপ্ত observation-এর ফলে আমার মনে শিক্ষার প্রকরণপদ্ধতি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মেছে বলে আমার বিশ্বাস, এবং কতকটা সেই বিশ্বাসের বলে এ সভায় মুখ খুলতে সাহসী হয়েছি।

এ সাহসের অন্য কারণও আছে। আমি একটি বিশেষ ছাত্রকে খুব ভালরকমই জানি, এবং সে ছাত্র হচ্ছেন স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী। আমি বহুকাল পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করেছি, কিন্তু অদ্যাবধি

---

* বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত আলোচনা সমিতির প্রথম অধিবেশনে পঠিত।

বিদ্যার্থীই রয়ে গিয়েছি। এই বিদ্যার্থীটির শিক্ষার ভার আমি পঠদ্দশাতেই অনেক পরিমাণে নিজের হাতে নিই, তার পর থেকে যিনি ছাত্র তিনিই তার গুরু হয়েছেন। এ সূত্রেও গুরুগিরির সার্থকতা ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে আমার কতকটা জ্ঞানলাভ হয়েছে। তাই বলে অবশ্য এ ভুল আমি কখনও করে বসি নি যে, শিক্ষার যে পদ্ধতি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে উপযোগী, সেই পদ্ধতি সকলের পক্ষে সমান উপযোগী। জ্ঞানের ক্ষুধাও সকলের মনে সমান নয়, তারপর এ বিষয়ে মানুষের রুচিও বিভিন্ন, অধীত-বিদ্যা জীর্ণ করবার শক্তিও কমবেশ। শিক্ষা সম্বন্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতা যে কতদূর সঙ্কীর্ণ ও অশাস্ত্রীয়, সেই জ্ঞান আমার ছিল বলে, আমি ইউরোপের নব শিক্ষাশাস্ত্রের ও কিঞ্চিৎ চর্চ্চা করেছি।

(২)

শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং উপায় সম্বন্ধে সকল দেশেই পণ্ডিতে পণ্ডিতে নানারূপ মতভেদ আছে। মানুষের মন নিয়ে যেখানে কারবার, সেখানে সকলের পক্ষে একমত হওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব; তা সত্ত্বেও ইউরোপ ও আমেরিকার বহু শিক্ষাচার্য্য ও দার্শনিকদের বহুদিনের সমবেত চেষ্টায় শিক্ষারও একটি Science এবং Art ধীরে ধীরে গড়ে উঠ্‌ছে। এ শাস্ত্রকে Science নামে অভিহিত করা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। কেননা ছেলেদের মন ও দেহ সম্বন্ধে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী এমন কতকগুলি সত্য আবিষ্কার করেছেন যা, দেশকাল-নির্ব্বিচারে বালকমাত্রেরই সম্বন্ধে সমান সত্য। এবং এই সত্যের উপরেই শিক্ষার নব-পদ্ধতি গড়ে তোলবার চেষ্টা হচ্ছে। শিক্ষার এই নব আর্টের সার্থকতা হচ্ছে এই যে, এ আর্টের জ্ঞান থাকলে শিক্ষকেরা ভুল পথে যান না। অর্থাৎ—তাঁরা এর সাহায্যে ছেলেদের সুশিক্ষা দিতে পারুন আর নাই পারুন—কুশিক্ষা দেন না। এও একটা কম লাভের কথা নয়। সুচিকিৎসার গুণে রোগী রক্ষা পাক্ আর না পাক্, কুচিকিৎসার ফলে সে বেচারা মারা যায়। এই শিক্ষা-শাস্ত্রের চর্চ্চা করলে স্কুল মাষ্টারেরা আর হাতুড়ে থাকেন না।

আমি আজকের সভায় এই Science এবং আর্টের আংশিক পরিচয় দেব স্থির করেছিলুম—এই মনে করে যে, সে পরিচয় দিতে গিয়ে আমি বিপদে পড়ব না, অর্থাৎ—বিবাদের সৃষ্টি করব না। ইংরাজি ও ফরাসী গ্রন্থ থেকে শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছি, সে তথ্য বাঙলা করে আপনাদের কাছে নিবেদন করলে, আমি প্রথমত আত্মমত প্রকাশের দোষে দোষী হতুম না, দ্বিতীয়ত Professor James, Professor Findlay, Professor Dewey, Alfred **Fouille** প্রভৃতি বড় বড় মনীষীদের বাক্যাবলীতে আমার প্রবন্ধ অলঙ্কৃত করতে পারতুম; তাতে আমার প্রবন্ধের যে গৌরব বৃদ্ধি হত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। সে যাই হোক, যে-কোন বিষয়েরই হোক না কেন, বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রধান গুণ এই যে, সে আলোচনায় আমাদের রাগদ্বেষ প্রকাশ করবার তেমন সুযোগ পাওয়া যায় না, এবং তার ফলে শ্রোতাদের অন্তরেও তাদৃশ রাগদ্বেষ আমরা উদ্রেক করি নে। আর ধর্ম্ম এবং পলিটিক্সের মত, শিক্ষাও যে এ যুগে মানুষে মানুষে একটা মারামারি কাটাকাটির ব্যাপার হয়ে উঠেছে, ইউরোপের আজ একশ বৎসরের ইতিহাস পাতায় পাতায় এই অপ্রিয় সত্যের পরিচয় দেয়। বিশেষত শিক্ষার সমস্যা যখন হয় ধর্ম্ম, নয় পলিটিক্সের সঙ্গে জড়িয়ে যায়, তখন সেই সমস্যা নিয়ে লোক-সমাজকে যে কি পরিমাণ উত্তেজিত করা যায়, তার প্রমাণ এই যে, বর্ত্তমান যুগে ফ্রান্স জর্ম্মানি বেলজিয়াম ইতালি প্রভৃতি দেশে, মধ্যে মধ্যে গুলিগোলার সাহায্যে সে সমস্যার আশু মীমাংসা করা হয়েছে। আর এ কথা আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, জাতীয় শিক্ষা জিনিষটে অতি সহজেই ধর্ম্ম পলিটিক্স ইকনমিক্স প্রভৃতি জাতীয় আধ্যাত্মিক এবং আর্থিক সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে; এর জলজ্যান্ত প্রমাণ আমাদের দেশেও স্বদেশী আন্দোলনের সময় পাওয়া গেছে। তখন পলিটিক্সকে মুখ্য করেই আমরা শিক্ষা সমস্যার একটা নূতন মীমাংসা করবার চেষ্টা করেছিলুম। তার ফল কি দাড়িয়েছে, তা আপনারা সকলেই জানেন। আমরা গড়তে চেয়েছিলুম একটি নব-নালন্দ—আমাদের

হাতে কিন্তু সেটি হয়ে উঠেছে একটি workshop, এ ব্যর্থতার কারণ কি?—এর কারণ, আমরা শিক্ষাকে একটি বিশেষ পলিটিক্যাল উদ্দেশ্যসাধনের উপায়-স্বরূপ গণ্য করায়, যথার্থ শিক্ষার কোনও সুব্যবস্থা করতে পারি নি। উত্তেজনার মুখে কোনও কাজ করতে গেলে আমাদের পক্ষে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবারই সম্ভাবনা বেড়ে যায়, বিশেষত সেই সকল ব্যাপারে, যে ব্যাপারে সাফল্য লাভ করতে হলে কিঞ্চিৎ স্থিরবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির সহায়তা দরকার। বলা বাহুল্য লৌকিক আন্দোলনের প্রসাদে লোকের দৃষ্টি একমাত্র বর্ত্তমানের উপরেই আবদ্ধ থাকে, এবং সে অবস্থায় লোকের অন্তরে হৃদয়াবেগ, বিচারবুদ্ধির স্থান অধিকার করে।

(৩)

এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার উদ্দেশ্য এই যে, যে-তর্ক আমি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলুম, আপনাদের সেক্রেটারি মহাশয় আমাকে পরোক্ষভাবে সেই তর্কে যোগদান করতেই আহ্বান করেছেন। আজকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতকার্য্যতা নিয়ে দেশে একটা মহা আন্দোলন চলেছে। ফলে একটা দলাদলি সৃষ্টি হবারও উপক্রম হয়েছে। এ আন্দোলনে লিপ্ত হতে হলে এর এক পক্ষ, নয় আর এক পক্ষ অবলম্বন করতেই হবে, নচেৎ কোন পক্ষই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না, দু'পক্ষই সমান নারাজ হবেন। তার ফলে কোন পক্ষই আমার কথার কিছুমাত্র দাম দিতে রাজি হবেন না। অথচ এ ক্ষেত্রে কোন একটা দিক নিয়ে ওকালতি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরের খবর জানি নে,—না তার আয়ব্যয়ের হিসাব, না তার অধ্যাপকমণ্ডলীর গুণাগুণ। বিশ্বসরস্বতীর মন্দিরে তাঁর পূজো অথবা শ্রাদ্ধে দেশের টাকা পণ্ডিত-বিদায় কিম্বা কাঙালীবিদায়ে বরাদ্দ হচ্ছে, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে জজ হয়ে বসবার পক্ষে আমার একটু বিশেষ বাধা আছে। আমি হচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ঠিকে অধ্যাপক। এ অবস্থায় আমার রায়ের নিরপেক্ষতায় কেউ বিশ্বাস করিবেন না। সে রায় যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটুও স্বপক্ষে হয়, তাহলে লোকে বলবে যে আমি ইউনিভার্সিটির নুন খাই বলে

তার গুণ গাচ্ছি; আর সে রায় যদি উক্ত বিদ্যালয়ের একটুও বিপক্ষে হয়, তাহলে লোকে বলবে যে আমি নিমক-হারাম। এই উভয়সঙ্কটে পড়ে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে না-ছুঁয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে দু'-চারটি সাধারণ কথা বলতে চাই।

এ কালে একটি ইউনিভারসিটি চালানো বহু ব্যয়সাধ্য এবং ইউরোপ আমেরিকার সকল শিক্ষাচার্য্যের মতে দিনের পর দিন সে ব্যয় বেড়েই যাবে। এক উচ্চ-শিক্ষা বন্ধ করা ছাড়া, এ ক্ষেত্রে ব্যয়ভার লাঘব করার উপায়ান্তর নেই। ইউনিভারসিটি কমিসনের রিপোর্ট অদ্যাবধি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি, সুতরাং তার ভিতর সাপ ব্যাঙ কি আছে, আমি কিছুই বলতে পারি নে। কিন্তু আমি ভরসা করে বলতে পারি যে, কমিসনের মতে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যে যথার্থ বিদ্যালয় হয়ে উঠতে পারে নি, তার অন্তত একটি কারণ তার দারিদ্র্য। দরিদ্র বিদ্যালয় যে কি করে বিদ্যার খয়রাত করবে, তার হিসেব পাওয়া কঠিন।

এর উত্তরে অনেকে বলেন যে, সু-গৃহিণীর কাজ হচ্ছে আয় বুঝে ব্যয় করা। আয় বাড়াবার চেষ্টা না করে ব্যয় কমাবার দিকে যত্ন করা যাঁরা সুবুদ্ধির কাজ মনে করেন, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা দিচ্ছেন। Post-graduate শিক্ষা ছেঁটে দেবার প্রস্তাব চারিদিক থেকে শোনা যাচ্ছে। এরূপ অস্ত্র-চিকিৎসার ফলে ইউনিভারসিটির দেহভার অবশ্য অনেকটা লাঘব হয়ে আসবে, তবে তাতে তার স্বাস্থ্য ও শক্তি বাড়বে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু এ প্রস্তাবের অর্থ কি জানেন?—বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তমাঙ্গ ছেদন করা। উচ্চশিক্ষার উচ্চতা নষ্ট করা যে সে শিক্ষার উন্নতির সদুপায়, এ জ্ঞান আমার পূর্ব্বে ছিল না; আমার চিরকেলে বিশ্বাস এই যে, উচ্চ শিক্ষার সার্থকতা উচ্চ থেকে উত্তরোত্তর উচ্চতর হওয়ায়। উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থাই যথার্থ সুব্যবস্থা, যার ফলে সমাজের অবস্থান্তর ঘটে, যার সহায়তায় মানুষ জীবনের নিম্নস্তর হতে উচ্চস্তরে আরোহণ করে। উচ্চশিক্ষা জিনিসটিকে আমরা যে

এতদূর বহুমূল্য মনে করি, তার এক মাত্র কারণ—আমাদের বিশ্বাস সে শিক্ষার প্রসাদে মানুষ উচ্চতর জীব হয়।

আমার এ কথার উত্তরে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে যাঁরা ব্যয়-কুণ্ঠ নন তাঁরা বলবেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগটি আগাগোড়া ফাঁকি ও ভুয়ো। এ বিষয়ে অনুষ্ঠানের ক্রটি নেই, অথচ কাজে কিছু হয় না। এ বিভাগের কোন কোন ক্ষেত্রে নাকি অধ্যাপক আছে কিন্তু ছাত্র নেই; এবং যে সকল ক্ষেত্রে ছাত্র আছে, সে সকল ক্ষেত্রে অধ্যাপকেরা নাকি একেবারেই অকর্ম্মণ্য।

এ কথার প্রতিবাদ আমি করতে পারি নে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাব-বশত। তবে বিনা প্রমাণে অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে এই অপবাদ গ্রাহ্য ক'রে নিতে আমার মন সরে না। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা শতকরা নিরানব্বই জন হচ্ছেন আমাদের স্বজাতি। তাঁদের বিরুদ্ধে এ অপবাদ যদি সত্য হয়, তা হলে আমাদের জাতীয় বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কার একদম চূর্ণ হয়ে যায়। সমাজ যদি শিক্ষকদের দুরছাই করে, তাহলে শিক্ষার কি সদগতি হয়? এই অধ্যাপকদের মধ্যে অন্তত এমন জনকতক যদি থাকেন, যাঁরা অধ্যাপনার কাজটি ব্রতহিসাবে গ্রহণ করেছেন, তাহলেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। বাইবেলের সেই পাকা কথাটা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, many are called but few are chosen, এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে chosen few আছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই।

তারপর উচ্চশিক্ষার কোনো কোনো বিভাগে যে ছাত্র জোটে না, সে দোষ কি বিশ্ববিদ্যালয়ের, না সমাজের? B. L. পড়বার জন্য হাজার হাজার ছেলে জোটে, কিন্তু উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান শেখবার জন্য যে দুই চারিটির বেশি অগ্রসর হয় না, তার কারণ আমাদের মতে আইন অর্থকরী বিদ্যা; কাজেই সে বিদ্যা এতটা অনর্থকরী হয়ে উঠেছে। এটা অবশ্য খুব আনন্দের বিষয় নয়।

আসল কথা এই যে, উচ্চ শিক্ষার ফলাফল শিক্ষার্থীদের সংখ্যার উপর নির্ভর

করে না, নির্ভর করে তার উচ্চতার উপর। এস্থলে আমি আমার দার্শনিক গুরু Professor William James-এর গুটিকয়েক কথা উদ্ধৃত ক'রে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি নে। তিনি আমেরিকার শিক্ষকমণ্ডলীকে এই সত্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখতে বলেন যে—

"The renovation of nations begins always at the top among the reflective members of the State,and spreads slowly outward and downward."

ইউনিভারসিটি মাত্রেরই উদ্দেশ্য জনকতক reflective members of the State তৈরি করা, এবং তার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্তও রাখা চাই।

(৪)

আমরা যে আন্দোলনের সৃষ্টি করেছি, সেটির আসল বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নয়। বিশ্ববিদ্যালয় ত লর্ড কার্জনের University Act-এর ঠেলায় বহুদিন যাবৎ এই পথেই চলেছে। এতদিন ত কৈ আমরা এর হালচালের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করি নি। আজ কেন হঠাৎ আমরা এতটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলুম ?—

এর কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষার ফী ১৫ টাকা থেকে ২০ টাকা করা হয়েছে। এর ফলে জনকতক ছেলের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পথ পাছে বন্ধ হয়, এই ভয়ে আমরা বিচলিত হয়ে উঠেছি। সম্ভবত তাই হবে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, উচ্চ-শিক্ষা জিনিসটেই হচ্ছে আক্রা। ধরুন যদি বিশ্ববিদ্যালয় একদম অবৈতনিক হয়ে যায়, তাহলেও দরিদ্র-সন্তানের পক্ষে সেখানে শিক্ষালাভ করা একেবারে অনায়াসসাধ্য হবে না। কেননা প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার পরও আরও অন্তত চার-বৎসরের জন্য তার ভরণপোষণের ভার তার পরিবারকেই নিতে হবে। ষোল বৎসর বয়সে পৃথিবীর সকল দেশের ছেলেই উপার্জ্জনক্ষম হয়, সে বয়সে তাকে কর্ম্মক্ষেত্র থেকে দূরে রাখা একমাত্র অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু কি ধনী কি

দরিদ্র, সকলেই যদি নিজ নিজ ছেলেদের কর্ম্ম হতে লম্বা অবসর দেন, তাহলে দেশের আর্থিক দুরবস্থা বাড়বে বই কমবে না। এ সমস্যা পৃথিবীর সকল দেশেই উঠেছে, এবং সকল শিক্ষাচার্য্যের মতে প্রতি জাতিকেই এ বিষয়ে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এ সমস্যা পৃথিবীর কোন দেশেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার সমস্যা নয়। এ হচ্ছে Secondary education-এর সমস্যা। ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ছেলে ১৬ থেকে ১৮ বৎসর বয়সের মধ্যে স্কুলের শিক্ষা শেষ করে' কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। সুতরাং এই বয়সে তাদের কতদূর সুশিক্ষিত করা যায়, এই হচ্ছে সে দেশের শিক্ষার প্রধান সমস্যা। Secondary education-এর সঙ্গে সামাজিক জীবনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, সুতরাং এ শিক্ষার ব্যবস্থা অবস্থা বুঝেই করতে হয়। উচ্চশিক্ষার কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার অবশ্য যোগ আছে, কেননা স্কুলের চৌকাট ডিঙ্গিয়েই কলেজে ঢুকতে হয়। কিন্তু তাহলেও এ দুই শিক্ষার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, উপায়ও স্বতন্ত্র। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, উত্তেজনার মুখে বাণ নিক্ষেপ করলে সে বাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে যা দাবী করছি, আসলে তা আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার নিকট প্রাপ্য। আমার এ কথা যে সত্য, তার প্রমাণ আমরা post-graduate শিক্ষা বন্ধ করতে চাচ্ছি। ধরুন তা যদি বন্ধ করা যায়, তাহলে যাকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় বলি, তা একটি দু-ভাগে বিভক্ত Secondary School-য়ে পরিণত হবে। আমাদের দেশের B. A এবং B. Sc. দু'জনে পৃথকভাবে যে শিক্ষা অর্জ্জন করেন, জর্ম্মানী প্রভৃতি দেশে যারা School-leaving certificate নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তারা প্রতিজনে ঐ উপরোক্ত দু'জনের শিক্ষার সম্বল নিয়ে জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং আমাদের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত, উচ্চ শিক্ষার মাথা হেঁট করবার জন্য নয়, মাধ্যমিক শিক্ষাকে খাড়া করে তোলবার জন্য। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যে অনেক পরিমাণে নিষ্ফল হয়, তার মূল

কারণ এই যে, মাধ্যমিক শিক্ষার কাঁচা ভিতের উপর উচ্চ শিক্ষার পাকা এমারত গড়া যায় না।

(৫)

এখন প্রকৃত প্রস্তাবে আসা যাক। বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমার এ প্রবন্ধের বিষয় নির্ব্বাচন এবং সেইসঙ্গে নামকরণও করে দিয়েছেন। সে বিষয়ের নাম হচ্ছে আমাদের "শিক্ষা ও বর্ত্তমান জীবনসমস্যা"। আমার মতে নামটা উল্টে দেওয়াই শ্রেয় ছিল, অর্থাৎ—আলোচ্য বিষয়টি যদি "জীবন ও বর্ত্তমান শিক্ষাসমস্যা" হত, তাহলে তার আলোচনা কতকটা আমার আয়ত্তের মধ্যে আসত। জীবন জিনিসটি চিরকালই একটা সমস্যা; আর একমাত্র বিদ্যালয় কোনো দেশে কস্মিনকালে সে সমস্যার মীমাংসা করতে পারে নি; কেননা শিক্ষা জিনিসটেই হচ্ছে জীবনের একটা বিশেষ অঙ্গ, এবং শিক্ষা-সমস্যাটা জীবন-সমস্যারই অন্তর্ভূ'ত। শিক্ষার প্রভাব জীবনের উপর অবশ্যই আছে অন্তত থাকা উচিত;—কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, জাতীয় শিক্ষার উপর জাতীয় জীবনের প্রভাব প্রচ্ছন্ন হলেও প্রচণ্ড। বলা বাহুল্য যে, বিদ্যালয় জাতীয়-জীবন হতেই তার রস রক্ত সংগ্রহ করে, সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, শিক্ষার সার্থকতা কিম্বা ব্যর্থতা অনেকপরিমাণে জাতীয় জীবন ও জাতীয় মনের ঐশ্বর্য্য কিম্বা দৈন্যের উপর নির্ভর করে। স্কুলমাষ্টারের হাতে এমন কোনও পরশপাথর নেই, যার স্পর্শে ছেলেমাত্রেই সোনা হয়ে ওঠে। কি ভৌতিক জগৎ কি মানসিক জগৎ, উভয় ক্ষেত্রেই আলকেমিতে বিশ্বাস আমরা হারিয়ে বসে আছি। এ বিষয়ে মনে দুরাশা পোষণ করলে, অবশেষে আমাদের হতাশ হতেই হবে। প্রচলিত শিক্ষার দৌড় কতটা, সে বিচার না করেই দেশসুদ্ধ লোক তাঁদের ছেলেদের শিক্ষার সেই চল্‌তি পথটা ধরিয়ে দেন, তারপর যখন দেখেন যে সে পথ ধরে তারা কোন একটা সিদ্ধি কিম্বা ঋদ্ধির রাজ্যে পৌঁছতে পারলে না, তখন তাঁরা স্কুল কলেজের উপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন। এক কথায়, তাঁদের মনে স্কুলকলেজের উপর এক সময়ের অগাধ

এবং অযথা ভক্তি আর এক কালে সমান অগাধ ও অযথা রোষে পরিণত হয়। ছেলে পাস না কর্‌তে পারলে স্কুলকলেজের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, এমন বাপ-মা এদেশে দুর্লভ নয়। বলা বাহুল্য এরূপ মনোভাবের মূলে যতটা পুত্রবাৎসল্য আছে, ততটা বিচারবুদ্ধি নেই। আর এ কথাও নিশ্চিত যে, একমাত্র হৃদয়াবেগের বলে পৃথিবীটিকে জয় করা যায় না। কামনা শুধু আমাদের সাধনার পথ নির্দ্দেশ করে দিতে পারে, তার বেশি কিছু পারে না। সুতরাং শিক্ষার কাছ থেকে কি ফল আমরা কামনা করি, প্রথমেই সেটি জানা দরকার।

(৬)

বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে প্রশ্ন সাধু ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন, তার সাদা বাঙলা হচ্ছে—"আমাদের লেখাপড়ার সঙ্গে আমাদের পেটের সম্বন্ধ কি"? এ প্রশ্নটা অবশ্য মানুষে না জিজ্ঞাসা করে থাকতে পারে না, কেন না পেটের ভাবনা আমাদের অধিকাংশ লোকেরই আছে, তারপর আমাদের সম্প্রদায়ের লোক, অর্থাৎ—বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের পক্ষে এ ভাবনা সব চাইতে বড় ভাবনা এবং তাঁদের আশা যে স্কুল কলেজের শিক্ষার কৃপায় তাঁদের ছেলেরা হয় রসনা, নয় লেখনীর সাহায্যে, শুধু যে দুধেভাতে থাকবে তাই নয়, গাড়ি-ঘোড়াও চড়বে। আর যদি তা না হয় ত সে স্কুল কলেজের দোষ। বলা বাহুল্য যে, এ ইকনমিক-সমস্যার পূরণ, বিদ্যালয়ে একহাতে করতে একেবারে অসমর্থ।

আমাদের জাতীয় দৈন্যের কারণ-অনুসন্ধান করতে হলে স্কুল কলেজের বাইরে বহুদূরে যেতে হবে, এবং জীবনের অপর সকল ক্ষেত্রে গিয়ে পড়তে হবে। যুবকদের জীবনসংগ্রামের উপযোগী করে গড়া অবশ্য শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ, কিন্তু একমাত্র অর্থের দিকে নজর রাখলে আমরা শিক্ষার সকল অঙ্গ এবং সম্ভবত উত্তমাঙ্গই দেখতে পাব না। দেশসুদ্ধ স্কুল কলেজকে রাতারাতি Technical School-য়ে পরিণত করলে আমরা সভ্যতার উচ্চতম শিখরে এক লম্ফে যে আরোহণ করব না সে কথা বলাই বৃথা, যে কথা বলা প্রয়োজন সে

হচ্ছে এই যে, উক্ত উপায়ে আমরা যে শিল্প-বাণিজ্যে চোখের পলক না ফেলতেই ইউরোপের উপর টেক্কা দেব তার কোনই সম্ভাবনা নেই। একমাত্র Technical School-এর শিক্ষাও যে বিশেষ কোনো কাজের হয় না, এ হচ্ছে ইউরোপের পরীক্ষিত সত্য। টেকনিকাল স্কুলে শিখে নাকি লোকে শুধু টেকনিকাল স্কুলের মাষ্টারি করতেই শেখে! হাতে কলমে শিল্প শেখবার যথার্থ স্থান হচ্ছে কারখানা আর তার বৈজ্ঞানিক অংশ শেখবার যথার্থ স্থান হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। এই কারণে যারা কারখানায় কাজ করে তাদের সেই কাজের Science শেখবার জন্য কোনো কোনো ইউনিভারসিটিতে এক একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছে। কেননা একদিকে যেমন হাতে ধরে না শিখলে যথার্থ শিল্পী হওয়া যায় না, অন্য দিকে তেমনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাবে বড় শিল্পী হওয়া যায় না। এই সব কারণে আমার মতে শিক্ষা সম্বন্ধে মূল প্রশ্নটা হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্কের সম্বন্ধটা কি? ইহলোকে মস্তিষ্কই আমাদের একমাত্র নিয়ন্তা, হস্তপদাদি সব তার আজ্ঞাবহ অনুচর মাত্র।

(৭)

শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য কি, সে বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, শিক্ষাকে মানব-জীবনের কোনো একটি সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের উপায়স্বরূপ মনে করলে সে শিক্ষা হয় নিষ্ফল হয়, নয় তার ফল ভাল হয় না। আমাদের মনোমত কোনও একটি বিশেষ ছাঁচে সকলকে ঢালাই করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, কেন না সে উদ্দেশ্য সাধন করবার এ যুগে কোনো উপায় নেই। ইউরোপে দেখা গিয়েছে যে, ও-হেন চেষ্টার ফলে শিক্ষকদের সেই মনগড়া ছাঁচ অধিকাংশ স্থলে ভেঙ্গে গিয়েছে এবং যেখানে ভাঙ্গে নি, সেখানে যারা তাতে ঢালাই হয়ে এসেছে তারা মানুষ না হয়ে জড়পদার্থ হয়েছে, এবং তাদের নিয়ে সমাজকে যথেষ্ট ভুগতে হয়েছে। মানুষ ধাতু নয়, কিন্তু দেহমনে একটি organism, এবং এই organism-এর স্ফূর্ত্তির সহায়তা করাই শিক্ষার একমাত্র কাজ; এক কথায় শিক্ষার ধর্ম্ম হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি সাধনের দ্বারা জাতীয় জীবনের

উন্নতি সাধন। মনে রাখবেন যে, আমরা যাকে জাতি বলি সে হচ্ছে আসলে কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি এবং তাছাড়া আর কিছুই নয়। আর ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যখন মনের ও শক্তির পার্থক্য এবং তারতম্য আছে তখন শিক্ষারও এক উদ্দেশ্য হতে পারে না। শিক্ষার সেই ব্যবস্থাই সুব্যবস্থা যাতে বহু লোকের ব্যক্তিত্ব স্ফূর্ত্তি লাভ করে এবং যার ফলে জাতীয় শক্তি নানা দিকে বিকশিত হয়ে ওঠে এবং জাতীয় জীবন অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে। সকলের মাথাই যে ইউনিভারসিটির ক্ষুরে মোড়াতে হবে এমন কোনই কথা নেই। দেশসুদ্ধ লোকের মানুষ হওয়া চাই, কিন্তু সকলেরই পণ্ডিত হবার দরকার নেই। শিক্ষার এ উদ্দেশ্য যে সকলে সহজে মানতে চান না, তার কারণ, এদেশে আজও সকলে মানুষকে জীবহিসেবে দেখেন না, অনেকেই যন্ত্র হিসেবেই দেখেন।

তারপর অপরাপর জীবের সঙ্গে মানুষের একটি প্রকাণ্ড তফাৎ আছে। মানুষের অন্তরে মন বলে একটি পদার্থ আছে, জীবজগতের অপর কোনো প্রাণীর ভিতর যা নেই। পশু পক্ষীরা আজ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে যেখানে ছিল, আজও ঠিক সেইখানেই রয়েছে। কিন্তু মানবসমাজ এই তিন হাজার বৎসরের মধ্যে জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পকলায় অন্নে বস্ত্রে ধনে রত্নে যে এতটা ঐশ্বর্য্য-বান হয়ে উঠেছে, মানুষ যে আজ এ পৃথিবীর অদ্বিতীয় প্রভু, সে পরিণতির মূলে আছে তার মানস-বল। মানুষের উন্নতির কারণ এই যে তার মনকে শিক্ষা দেওয়া যায়,অর্থাৎ—তার আত্মশক্তিকে ফোটানোও যায় বাড়ানোও যায়। আমরাই হচ্ছি একমাত্র সেই শ্রেণীর প্রাণী যারা তাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত করতে পারে, এবং তা পরস্পরকে আদান প্রদান করতে পারে। আমরাই শুধু মনের কারবার করতে পারি এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানের মূলধনও বাড়াতে পারি। শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, আজ যারা ছেলে আর কাল যারা মানুষ হবে, পূর্ব্ব পুরুষের সঞ্চিত জ্ঞানের তাদের উত্তরাধিকারী করা, এবং সেই সঙ্গে তাদের অন্তরে নূতন জ্ঞান সঞ্চয় করা ও নূতন কর্ম্ম-কৌশল লাভ করবার প্রবৃত্তি ও শক্তির উদ্বোধন করা। যে যতটা জ্ঞান আত্মসাৎ করতে পারে, এবং যতটা

কর্ম্ম-শক্তি লাভ করতে পারে, সে ততটা শিক্ষিত। কিন্তু দুই-ই হচ্ছে আসলে মনের জিনিষ এবং এ-দু'য়ের ভিতর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করাই বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। একটা ইংরাজি বচন আমাদের মনের উপর এ যুগে অযথা রকম আধিপত্য লাভ করেছে, সে হচ্ছে struggle for existence. এ কথা নিত্য শুনতে পাওয়া যায় যে, সেই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা যা আমাদের struggle for existence-এর সহায়। ঐ মস্ত কথাটার সাদা অর্থ হচ্ছে "আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা"। এ প্রচেষ্টা জীব-মাত্রেরই অস্থি মজ্জাগত, এবং যেহেতু আমরাও জীব সে কারণ ও-প্রবৃত্তি আমাদের পক্ষেও নৈসর্গিক। কিন্তু পশু-পক্ষীর সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এই যে আমাদের ভিতর উপরন্তু আর একটি প্রবৃত্তি আছে, যার নাম আত্মোন্নতির প্রবৃত্তি। আমার শুধু আত্মরক্ষা করেই সন্তুষ্ট থাকিনে, মনে ও চরিত্রে মনুষ্যত্বের নিম্নস্তর হতে উচ্চস্তরে ওঠবার প্রচেষ্টাও আমাদের প্রকৃতিতে স্বাভাবিক। এবং শিক্ষা হচ্ছে এই প্রচেষ্টার প্রধান সহায়। যদি কেউ বলেন যে তা বটে, তবে আগে আত্মরক্ষা পরে আত্মোন্নতি। এর উত্তরে আমার বক্তব্য ও দুয়ের ভিতর ওরূপ পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ নেই। আত্মোন্নতির প্রচেষ্টাই যে আত্মরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়, এর প্রমাণ মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে দেয়।

(৮)

মানবজাতির যুগযুগান্তরের সঞ্চিত জ্ঞানে মানুষ মাত্রেরই যে অধিকার আছে এবং সে অধিকারে অধিকারী হলে, মনুষ্যত্ব যে স্ফূর্ত্তি লাভ করে এই বিশ্বাসের বলে ইউরোপ ও আমেরিকায় ষ্টেটের খরচায় প্রতি বালককে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতি বালক শিক্ষিত হতে বাধ্য। এরই নাম Compulsory primary education.

তারপর বার চৌদ্দবৎসরে এদের মধ্যে অধিকাংশকে জ্ঞানার্জ্জনের দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এর প্রধান কারণ economic,—দরিদ্রের সন্তানের এই বয়সেই জীবিকা অর্জ্জনের প্রয়োজন হয়, কেননা তাদের বেশি দিন নিষ্কর্ম্মা

রাখায় তাদের এবং সমাজের সমান ক্ষতি হয়। আরও একটি কারণ আছে। যাঁরা ছেলের মনের খোঁজ রাখেন তাঁদের মতে কৈশোরে পদার্পণ করবামাত্র অনেক ছেলের মনে কাজ করবার প্রবৃত্তি এবং সেই সঙ্গে জ্ঞান-চর্চ্চায় অপ্রবৃত্তি জন্মায়,—অর্থাৎ তারা বাঁধা না খেয়ে সংসারে চরে খেতে চায়। সুতরাং ও বয়সে তাদের জোর ক'রে কর্ম্মক্ষেত্র হতে দূরে রাখার কোনই সার্থকতা নেই। নিষ্ক্রিয় হ'লে যে জ্ঞানী হতেই হবে এমন কোনও নৈসর্গিক নিয়ম নেই। আমাদের যত ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তার ভিতর অনেকে যে যুগপৎ অশিক্ষিত ও অকর্ম্মণ্য হয়ে বেরোয় তার অন্যতম কারণ এই যে চৌদ্দ পোনেরো বৎসর বয়সে তাদের মনোমত কাজে তাদের লাগতে দেওয়া হয় নি।

তারপর চৌদ্দ থেকে আঠারো বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক ছেলেদের শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা করা হয় তার নাম secondary education. ইউরোপে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ছেলেদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা এইখানেই শেষ হয়। যৌবনে পদার্পণ করা মাত্র তারা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। আমাদের সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে এই Secondary education-ই সব চাইতে মূল্যবান, কারণ এই শিক্ষাই আমাদের অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রার প্রধান সহায়। আঠার বৎসর বয়সে বিদ্যালয় থেকে নানা বিষয়ে সেই শিক্ষালাভ ক'রে বহির্গত হওয়া আমাদের পক্ষে শ্রেয়, যে শিক্ষার ফলে জীবনের যে কোনও কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা কৃতিত্ব লাভ করতে পারব। আমাদের economic অবস্থার সঙ্গে এই শিক্ষাই যথার্থ খাপ খায়। সুতরাং এ শিক্ষার যাতে সুব্যবস্থা হয় সেই বিষয়েই আমাদের একান্ত যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। আর এই বয়েসের মধ্যেই যে যথেষ্ট সুশিক্ষিত হওয়া যায় তার প্রমাণ ইউরোপের সকল দেশেই পাওয়া যাবে।

তারপর যে ক'টি বাকী থাকে তারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ-শিক্ষা লাভ করতে চেষ্টা করে। এও কতকটা অবস্থার গুণে। উচ্চ-শিক্ষা ইউরোপের অবস্থাপন্ন সম্প্রদায়ের এক রকম একচেটে বললেও হয়। বাইশ তেইশ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত এক পয়সা রোজগার না করে পরিবারের অন্নে প্রতিপালিত এবং পরি-

বারের অর্থে উচ্চ শিক্ষিত হতে পারে এমন যুবকের দল সকল দেশেই দুর্লভ। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে তবে কি দরিদ্রসন্তান উচ্চ-শিক্ষা লাভের সুফলে বঞ্চিত হবে? তার উত্তর—অবশ্য হবে যদি না তাদের নিজগুণে Scholarship নেবার ক্ষমতা থাকে। দরিদ্র সমাজও যদি পৃথিবীর সকল ভাল জিনিষে ধনীর সঙ্গে সমান অধিকারী হত তাহলে দারিদ্র্য ত আর কষ্টের কারণ হত না। এরূপ হওয়া উচিত কি না, সে হচ্ছে শিক্ষার নয় সমাজের সমস্যা। ইউরোপের বহুলোকের মতে কোনও সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের এতটা অর্থগত পার্থক্য থাকাটা মোটেই মঙ্গলজনক নয়। এঁদের চেষ্টায় যদি Socialistic State গড়ে ওঠে তাহলে হয়ত mass education এবং high education একাকার হয়ে যাবে। কিন্তু যতদিন সমাজে বড় ছোটর প্রভেদ থাকবে ততদিন শিক্ষারও উচ্চ নীচ প্রভেদ থাকবে। তবে এ সব প্রশ্ন আমাদের মুখে শোভা পায় না। এই জাতিভেদের দেশে আমরা সমাজে ছোট বড়র প্রভেদ মোটেই দূর করতে চাই নে, তার উপর এদেশে ধনীর অপেক্ষা দরিদ্রেরাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে বেশি লালায়িত, তার কারণ অধিকাংশ ছেলের বাপ ছেলেকে উচ্চ-শিক্ষিত করতে চান না, সুধু ধনী করতে চান। এবং সেই কারণ উচ্চশিক্ষাকে যতদূর সম্ভব সস্তা করবার জন্য সকলে ব্যগ্র। এ মনোভাব স্বাভাবিক হলেও প্রশ্রয় পাবার উপযুক্ত নয়। আমার বিশ্বাস এইরূপ পারিবারিক মনোভাব দিয়ে জাতীয় শিক্ষা-সমস্যার সমাধান করা যায় না। ঘরের প্রদীপ ঘরই আলো করতে পারে কিন্তু বাইরের অন্ধকার ঘোচাতে পারে না; তার জন্য চাই বাইরের আলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষা যে কতটা অকিঞ্চিৎকর সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সজ্ঞান তবে আমার দুঃখের কারণ এই যে, আমাদের দেশের তথাকথিত উচ্চ-শিক্ষিত সম্প্রদায় যথার্থ সুশিক্ষিত সম্প্রদায় নন। যদি তাঁরা সত্যই সুশিক্ষিত হতেন তাহলে কোন আপশোষের কারণ থাকত না, কেন না আমাব দৃঢ় ধারণা যে যে-জাতির অনেকে সুশিক্ষিত সে জাতির কি আর্থিক কি আধ্যাত্মিক দুই ক্ষেত্রেই উন্নতি অনিবার্য্য।

(৯)

এ সত্য নিঃসন্দেহ সর্ব্ববাদী সম্মত যে, যে-শিক্ষা মানুষের মনকে মুক্তি দেয় না শক্তি দেয় না, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। আর জীবনের উপর যে মনের কোন স্ব-প্রভাব নেই সে মন মুক্তও নয়, শক্তিশালীও নয়; এক কথায় শিক্ষিতই নয়।

আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে জীবনকে চেপে ধরতে পারেন নি, এবং নিজ শক্তিতে তা যে মনোমত করে গড়ে তুলতে পারছেন না,—তার প্রমাণ আজকের দিনের এই অন্ন-সমস্যা। এই ব্যর্থতার পরিচয় একমাত্র economic ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সমান পাওয়া যাবে। এই নব-শিক্ষার প্রভাব যে আমাদের সামাজিক জীবনের উপর এক রকম নগণ্য—তা কে অস্বীকার করবে? আর এ কথাও নিঃসংশয় যে আমরা যাকে ইকনমিক-সমস্যা বলি সেটি আমাদের সামাজিক মনোভাব, সামাজিক চরিত্র ও সামাজিক বিধি নিষেধের, এক কথায় সামাজিক জীবনের বিশেষরূপে অধীন। যদি কোন সমাজের প্রিয়প্রথা ও চিরাগত সংস্কার সকল বর্ত্তমান যুগে Struggle for existence-এর অনুকূল হওয়া দূরে থাক প্রতিকূল হয় তাহলে সে প্রথা ও সে সংস্কার বজায় রেখে জীবন-সংগ্রামে কি করে জয়ী হওয়া যেতে পারে? একমাত্র রসনা ও লেখনীর বলে? লেখনী ও রসনার শক্তিতে আমি অবিশ্বাসী নয়—কিন্তু সে শক্তি সত্যের আশ্রয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করে ও বৃদ্ধি পায়। মনোজগৎ ও বস্তুজগৎ এ উভয় রাজ্যের যথার্থ জ্ঞানের উপরই মানুষের আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠিত। রসনা ও লেখনী দুইই অবশ্য মিথ্যাকে জন্ম দিতে পারে এবং তাকে প্রশ্রয়ও দিতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা ব্যক্তি বিশেষকে কিম্বা জাতি বিশেষকে সুস্থ করতে পারে না, সজ্ঞান করতে পারে না, সক্রিয় করতে পারে না। আর সত্যের উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, সত্যপ্রিয় হওয়া চাই সত্যসন্ধিৎসু হওয়া চাই, সত্যসন্ধ হওয়া চাই।

✓বিদ্যালয় ছেলেদের কাছে যুগযুগান্তর-সঞ্চিত জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে দেয়,

সে জ্ঞান আত্মসাৎ করা আর না করা সম্পূর্ণ ছেলের এক্তিয়ার। উচ্চ-শিক্ষা যুবকদের সঙ্গে মনুষ্যত্বের উচ্চ মনোভাব উচ্চ আইডিয়ালের পরিচয় করিয়ে দিতে পারে—কিন্তু সে ভাব সে আইডিয়াল, যুবকদের মনে ঢুকিয়ে দিলেও সম্পূর্ণ বসিয়ে দিতে পারে না, যদি বাপ মা শিক্ষকের এবং সমাজ বিদ্যালয়ের সহায়তা না করে। ভুলে যাবেন না যে বিদ্যালয় একমাত্র শিক্ষালয় নয়—প্রতি পরিবার এক একটি শিক্ষালয় আর সমাজ হচ্ছে একটি মহাবিদ্যালয়। সমাজ যদি বিদ্যালয়ের উল্টো টান টানে তাহলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার ফল কি হবে? স্কুল কলেজে অর্জ্জিত জ্ঞান আমাদের মনের উপর একটা বোঝামাত্র হয়ে থাকবে, এবং সে ক্ষেত্রে সংগৃহীত আইডিয়াল স্বধু বক্তৃগত হয়ে থাকবে।

এখন আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, সমাজ কি সত্যই চায় যে স্কুল কলেজের শিক্ষা সত্য সত্যই দেশের ছেলের মনে বসে যাক এবং তারা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করতে শিখুক? অপর পক্ষে এই কথাটাই কি সত্য নয় যে, সমাজ চায় এই নব-শিক্ষা যেন ছেলেদের মন স্পর্শ না করে; এবং যে মন দিয়ে স্কুল কলেজের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে আর যে মন দিয়ে জীবনের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে—এ দুই মন সমান্তরাল রেখায় ইংরাজিতে যাকে বলে parallel lines-য়ে চলুক। আমরা চাই যে আমাদের ছেলেরা স্কুলে বলবে পৃথিবী গোল, আর ঘরে এসে মানবে যে পৃথিবী ত্রিকোণ। কেন না একবার যদি তারা তাদের শিক্ষার দ্বারা আমাদের সামাজিক সংস্কার গুলোকে যাচাই করতে স্বরু করে তাহলে তারা হয়ত দেখতে পাবে যে অনেক জিনিস যা আমরা চৌকোশ বলে ধরে নিয়েছি তা স্বধু গোল নয়, মহাগোল। এরূপ মনোভাবের মূল কি তা আমি সম্পূর্ণ জানি। আমাদের শিক্ষা একে বিদেশী, তায় আবার নূতন—আর আমাদের সমাজ একে স্বদেশী তায় আবার প্রাচীন, স্থতরাং এর একটিকে টিঁকিয়ে রাখতে হলে অপরটিকে হীনবীর্য্য করে দিতেই হবে। তাই অন্ধ সংস্কারের সাহায্যে আমরা শিক্ষাকে পঙ্গু করে ফেলতে সদাই যত্নবান।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, যে শিক্ষায় মানুষের মনকে যুগপৎ মুক্তি ও শক্তি না দেয়, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়, কেননা তাতে মানুষকে person করে তোলে না। বহুকাল পূর্ব্বে জগৎ-পূজ্য জর্ম্মান দার্শনিক কাণ্ট এই মহাসত্যের আবিষ্কার করেন যে, person শব্দের অর্থ হচ্ছে Self conscious self-determining individual. মানুষে পশুতে এই খানে তফাৎ যে, পশু মাত্রেই কতকগুলি নৈসর্গিক প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত, তাদের ভিতর personality বলে কোনও জিনিস নেই। এইখানেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষের মনে এবং চরিত্রে Self consciousness and self-determination-এর শক্তি উদ্বুদ্ধ করতে হলে তাকে চিন্তা করবার ও কাজ করবার স্বাধীনতা দেওয়া একান্ত দরকার। তারপর আর একটি কথা ;—আমরা যাকে শক্তি বলি তার অর্থ হচ্ছে reality-র উপর প্রভুত্ব করবার ক্ষমতা—বলা বাহুল্য reality-র জ্ঞান না জন্মালে কেউ আর তার উপর প্রভুত্ব করতে পারে না। আমাদের নব-শিক্ষার প্রসাদে আমাদের reality-র জ্ঞান বাড়া দূরে থাক ক্রমে যে কমে আসছে তার কারণ আমাদের নব-শিক্ষা আমাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। শিক্ষা জিনিসটি সব দেশেই একটি সমস্যা কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটি যে এত ভীষণ সমস্যা হয়ে উঠেছে তার প্রধান কারণ সে শিক্ষা আমাদের জীবনের পক্ষে অস্পৃশ্য। আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা, ইকনমিক অবস্থা; সামাজিক ব্যবস্থা সবই এমন, যে আমাদের শিক্ষালব্ধ জ্ঞান-বুদ্ধি জীবনের কোন ক্ষেত্রেই খাটাবার আমরা সুযোগ পাই নে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা খাটাবার আমাদের অধিকার পর্য্যন্ত নেই।—

এ অবস্থায় মনের সুখে থাকতে পারেন শুধু তাঁরা যাঁরা নিজের জীবন স্বচ্ছন্দে কেটে গেলেই পরের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, এবং পরের দুরবস্থা যদি কালেভদ্রে চোখে পড়ে ত এই বলে মনকে আশ্বস্ত করেন যে, সে দুরবস্থা তাদের পাপেরই শাস্তি। কিন্তু এদেশে এমন লোকেরও অভাব নেই যারা এই অতিনিন্দিত নব-শিক্ষার প্রসাদে স্বজাতির এই বর্ত্তমান দুর্গতি সম্বন্ধে-

চিত্তে গ্রাহ্য করে নিতে পারেন না, কিম্বা মোটার গাড়ীতে চড়ে কলেজষ্ট্রীট দিয়ে যাবার সময় ইউনিভারসিটি Buildings নামক বুরোক্রাট এবং পেট্রিয়টের সমান চক্ষুঃশূল সরস্বতীর মন্দিরটিকে অম্লান বদনে ভূমিসাৎ করে দেবারও প্রস্তাব করতে পারেন না। দেশ উদ্ধারের অত সহজ মীমাংসা করবার পক্ষে তাঁদের জ্ঞান ও বুদ্ধি উভয়েই প্রতিবাদী হয়। ভবিষ্যতে বাঙালী জাতি, আমাদেরই অনুরূপ হবে, আমাদেরই মত তারাও নির্জ্জীব, নিরানন্দ এবং পরভাগ্যোপজীবী হয়ে থাকবে, আমাদেরই মত তারা স্বধু ধনে নয় মনে ও চরিত্রেও মধ্যবিত্ত হবে, আমাদেরই মত তারা জীবনের উৎসবের দর্শক মাত্র থাকবে, কিন্তু তাতে যোগদান করবার অধিকার লাভ করবে না; এ কথা মনে হলে এ শ্রেণীর লোকদের মন নৈরাশ্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তখন জীবনের স্বাদ তাদের মুখে তিতো লাগে। কিন্তু এ নৈরাশ্যকে প্রশ্রয় দিতে আমরা মোটেই চাই নে। একটি ইংরেজ লেখকের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলছি যে, খানায় পড়ে থাকলেও আকাশের তারা দেখবার অধিকারে মানুষ বঞ্চিত হয় না। আমাদের ভবিষ্যতের গগনে সেই তারা দেখতে পাই বলে আমরা শিক্ষার উন্নতির জন্য এত লালায়িত। যদি কেউ বলেন যে আমরা যা দেখছি সে তারা নয়—আকাশ-কুসুম, তার উত্তর তথাস্তু—কিন্তু তাই বলে খানায় পড়ে থাকাটাই যে বুদ্ধিমানের কাজ, এ কথা মানতে আমরা প্রস্তুত নই। ওঠবার চেষ্টা আমাদেরই করতেই হবে, ফলাফল অদৃষ্টের হাতে।

(১০)

আমি বরাবর শিক্ষার উন্নতি, সমাজের উন্নতি, জাতির উন্নতি প্রভৃতি নানারূপ উন্নতির কথা বলে আসছি কিন্তু কি উপায়ে সে উন্নতি সাধন করা যেতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ কোনও কথা বলি নি। বর্ত্তমান শিক্ষার সর্ব্বাগ্রে কোন্ সংস্কার করা প্রয়োজন, সংক্ষেপে সেই কথাটা বলে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করব। কারণ আমার ধারণা যে, সে সংস্কার না করে অপর সংস্কার করতে যাওয়া হচ্ছে শিক্ষার গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া।

উন্নতি অবশ্য পরিবর্ত্তন সাপেক্ষ। জড়পদার্থের ধর্ম্ম এই যে তার নিজের ভিতর থেকে কোনও পরিবর্ত্তনের তাগিদ আসে না। লোষ্ট্রকাষ্ঠ অনন্তকাল পর্য্যন্ত এক অবস্থাতেই থাকতে পারে, যদি বাহ্যশক্তি তার পরিবর্ত্তন না ঘটায়।

জীবের ইতিহাস হচ্ছে নিত্য তার অবস্থার পরিবর্ত্তনের কাহিনী। প্রথমত বৃদ্ধির তারপর হ্রাসের। বীজ হতে বৃক্ষ জন্মায়, বড় হয়, একটা সীমা পর্য্যন্ত বাড়ে তারপর উত্তরোত্তর তার জীবনী-শক্তির হ্রাস হয়ে এসে শেষে তার মরণ দশা উপস্থিত হয়। কিন্তু এই হ্রাসবৃদ্ধি হয় নৈসর্গিক কারণে, এ অবস্থান্তর ঘটার ভিতর তার মনের কিম্বা ইচ্ছার কোন কার্য্য নেই। তার জীবন-মরণ দুই-ই দৈবাধীন, সে বেচারা অপমৃত্যুকেও এড়াতে পারে না, আত্মহত্যাও করতে পারে না।

মানুষের ধর্ম্ম কিন্তু স্বতন্ত্র। আমাদের দেহের হ্রাসবৃদ্ধির উপর আমাদের বিশেষ কোনও হাত নেই। আমরা ইচ্ছা করিলে পর্ব্বত প্রমাণ উঁচুও হতে পারি নে, চিরদিন দেহে ছোট-ছেলেও থেকে যেতে পারি নে। কিন্তু মনের হ্রাসবৃদ্ধি অনেকটা আমাদের আয়ত্তাধীন। আমরা ইচ্ছা করলে মনে ছোট ছেলেও থেকে যেতে পারি, জ্ঞানী গুণীও হয়ে উঠতে পারি। তাই সমাজ সভ্যতা প্রভৃতি জিনিস মানুষ তার মনোমত করে গড়তে পারে এবং সে গড়ার ভিতর মানুষের ইচ্ছা শক্তিই আসল শক্তি। সংক্ষেপে মানুষে আত্ম-চেষ্টায়— তার অবস্থার অশেষ পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে, এবং মানব-সমাজের উন্নতি তার অভিপ্রায়কে অনুসরণ করে—সে উন্নতি অদৃষ্ট নয়, পুরুষকারের উপর নির্ভর করে। অপর পক্ষে মানুষ আত্মহত্যাও করতে পারে।

মানুষ স্বেচ্ছায় নিজেকে বদলাতে পারে সে বদল উন্নতিও হতে পারে অবনতিও হতে পারে। প্রতি বদলের মুখে এ উভয় সঙ্কটে মানুষকে যে পড়তে হয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে এ কথাও নিঃসন্দেহ যে অবনতির ভয়ে যদি মানুষের আত্ম-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা বন্ধ করো তাহলে সেই সঙ্গে তার উন্নতির পথও রোধ করা হবে। সুতরাং এ

বিষয়ে মানব-সমাজকে experimemt করতে দিতেই হবে, ফলে উন্নতি কি অবনতি হবে তার প্রমাণ ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে।

মন ও জীবনের এই লড়ালড়ি পৃথিবীর সকল দেশে চিরদিনই চলে আসছে, কারণ মন চিরকালই জীবনকে নূতন পথ দেখাতে চায়, আর জীবন চিরকালই তার অভ্যস্ত পথ ত্যাগ করতে আপত্তি করে। এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক Bergson বলেন যে, জীবনের পক্ষে এক জায়গায় জমে গিয়ে জড়-পদার্থে পরিণত হবার দিকে একটা সহজ প্রবণতা আছে, সেই জন্য মনের কর্ত্তব্য হচ্ছে তাকে ক্রমান্বয়ে টেনে তোলা, নূতন নূতন পথে তাকে চালিত করা।

নব শিক্ষার সহিত প্রাচীন সমাজের এই লড়াই সব দেশে সব যুগেই হয়ে আসছে। আমাদের দেশে যে হচ্ছে তার ভিতর কিছুমাত্র নূতনত্ব নেই। এমন কি দু-পক্ষ সকল দেশে একই বুলি আওড়ান। নূতন জ্ঞান এবং, তৎপ্রসূত নূতন আইডিয়াল জীবনকে ডেকে বলে, আমাকে অনুসরণ কর, তোমাকে উন্নতির পথে নিয়ে যাব, আর প্রথা-গ্রস্ত জীবন বলে যে-পথে বহুদিন চলে আসছে সে পথ ত্যাগ করলে সর্ব্বনাশ হবে, কেননা তোমার ঐ নূতন পথ ত্রিদিবের নয়, রসাতলের পথ।

তবে নূতনত্বের মধ্যে এইটুকু যে অপর দেশে নবশিক্ষা সামাজিক জীবনকে খাড়া করে তোলে আর আমাদের দেশে সামাজিক জীবন নব শিক্ষার কোমর ভেঙ্গে দেয়। এর কারণ কি?—উত্তরও সহজ, আমাদের নব শিক্ষা বিদেশী শিক্ষা বলেই, জীবনের উপর তার প্রভাব কম। কিন্তু এ উত্তর সহজ হলেও সত্য নয়। পৃথিবীর ইতিহাস যুগ যুগ ধরে, এই সত্যেরই পরিচয় দিচ্ছে যে, এক জাতির মন অপর আর এক জাতির মনের স্পর্শে জেগে ওঠে, সংঘর্ষে সজ্ঞান হয়। কালক্রমে জাতীয় মন যখন নিবে আসবার উপক্রম হয়, তখন বাইরে থেকে তাকে উসকে দেওয়া দরকার। সত্য, তা সে দেশীই হোক বিদেশীই হোক সত্য, এবং সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এদেশে শিক্ষার এ-দুর্গতির কারণ যে সে শিক্ষা বিদেশী ভাষাতে দেওয়া হয়।

আমরা এই বলে জাঁক করি যে ইংরাজি আমরা যেমন শিখি পৃথিবীর অপর কোনও জাত তেমন শিখতে পারে না। কথাটা কিন্তু সত্য নয়। অপর জাতের সঙ্গে নিজেদের তুলনা না করে যদি নিজেদের বিত্তের বহরটা মেপে দেখি ত, দেখতে পাই যে আমাদের অধিকাংশ লোকের ইংরাজি জ্ঞান যেমন মুষ্টিমেয় তেমনি খেলো। অধ্যাপকেরা বই না পড়িয়ে নোট দেন বলে তাঁদের উপর চারধার থেকে আক্রমণ হচ্ছে। কিন্তু এ নোট-দানের কারণ কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যার্থীদের অধিকাংশের ইংরাজিভাষায় দখল এত কম যে তাঁরা Text-book পড়ে তার মর্ম্ম উদ্ধার করতে পারেন না, নিজের ইংরাজিতে সে মর্ম্ম প্রকাশ করা ত তাঁদের একেবারে সাধ্যের অতীত। এ অবস্থায় অধ্যাপকদের দায়ে পড়ে, বিশ্ববিদ্যার সার-সংগ্রহ করে তার এমন সব নিরেট বড়ি পাকিয়ে দিতে হয়, ছেলেরা যা কলেজে গিলে সেনেট হলে উগলে দিতে পারে। ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, যে যত বেশি বড়ি গিলিয়ে দিতে পারে সে তত ভাল অধ্যাপক, আর যে যত বেশি বড়ি ওগলাতে পারে সে তত ভাল ছেলে। তারপর আর একটি কথা, হাজার অপ্রিয় হলেও সত্যের খাতিরে আমি বলতে বাধ্য। অধ্যাপক মহাশয়দের মধ্যে অনেকের ইংরাজি-জ্ঞান ছাত্র-বাবুদের জ্ঞানের চাইতে বড় বেশি প্রবৃদ্ধ নয়। এর কারণও স্পষ্ট। কাল যাঁরা শিষ্য ছিলেন আজ তাঁরা গুরু। হতে পারে যে জর্ম্মাণ ফরাসী ইতালীয়দের চাইতে আমাদের ইংরাজি জ্ঞান বেশি। তার কারণ এ শিক্ষার আমরা যে দাম দিই সে দাম তারা দেয় না। সে দাম হচ্ছে স্ব-ভাষাকে ভাসিয়ে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে বাহ্যজ্ঞান হারানো। বিদেশী ভাষার মারফৎ পাওয়া-শিক্ষা আমাদের মনে বসে না, কথার কথা থেকে যায়। আমি এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে এত বক্তৃতা করেছি যে এস্থলে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আমাদের স্কুলে ছেলের মন এবং বস্তুজগতের মধ্যে, ইংরাজি ভাষা একটি পুরু পর্দ্দার মত ঝুলে থাকে, ফলে তাদের মনে reality-র জ্ঞান এক প্রকার নষ্ট হয়েই যায়। বস্তুর সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধ যে বাচ্য বাচকের সম্বন্ধ, বালককালে

বিদেশী ভাষা শিখতে গেলে সে জ্ঞান হারানো অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কারণ, বিদেশী ভাষার শব্দের সঙ্গে বস্তুর কোনও সাক্ষাৎ যোগাযোগ নেই, আছে শুধু স্বদেশী শব্দের সঙ্গে। Translation এবং re-translation-এর প্রসাদে শুধু এক ভাষার সঙ্গে অপর ভাষার সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মে। ভাষার সঙ্গে reality-র যোগাযোগের জ্ঞান জন্মে না।

স্কুলে এ জ্ঞান একবার হারালে কলেজে এসে আর তার পুনরুদ্ধার করা যায় না। এর প্রমাণ স্বরূপ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সম্প্রতি আমি এ বৎসরের প্রাথমিক B L-এর কাগজ পরীক্ষা করছি, শ'খানেক কাগজ দেখা হয়েছে, তার মধ্যে পাঁচখানিতে moveable এবং immoveable property-র কি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে জানেন?—দু'দিন পরে যাঁরা উকিল হবেন তাঁদের ধারণা যে-সম্পত্তি অচল, তাই immoveable property, যথা—পর্ব্বত; এবং যে-সম্পত্তি সচল তাই হচ্ছে moveable property, যথা—নদী। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির প্রভেদটা যে কি তা বাড়ীর চাকর দাসীরাও জানে, কিন্তু স্কুলের ইংরাজি শিক্ষার কৃপায় B. A. B. Sc. রাও জানেন না। একজন লিখেছেন যে, incorporeal property হচ্ছে সেই সম্পত্তি which has no physical existence, জবাব ঠিক হয়েছে, কিন্তু তিনি তার উদাহরণ দিতে গিয়ে copyright ইত্যাদির নাম উল্লেখ না করে, উল্লেখ করছেন "air." কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্! কিন্তু এর চাইতেও আশ্চর্য্যের বিষয় আছে। যিনি লিখেছেন air হচ্ছে সেই বস্তু যার কোনও physical existence নেই শুনতে পাই তিনি হচ্ছেন B. Sc. পাশ! এই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয় যে, স্কুলে সকল শিক্ষা ইংরাজি ভাষার মারফৎ হওয়াতেই আমাদের শিক্ষা এতটা নিষ্ফল হচ্ছে? আপনারা যদি Secondary School-য়ে ইংরাজিকে Second language করতে পারেন তাহলে আমার বিশ্বাস দশ বৎসরের ভিতর বাঙালী জাতির মনের চেহারা ফিরে যাবে, এবং তখন দেখা যাবে আমাদের শিক্ষায় ও জীবনে আর আকাশ-পাতাল প্রভেদ নেই।

আমি এই বলে এ প্রবন্ধ আরম্ভ করেছি যে, আমি একজন ষ্টুডেণ্ট এবং সেই ষ্টুডেণ্ট হিসেবেই আমি বর্ত্তমান শিক্ষা-সমস্যার আলোচনা করেছি, অর্থাৎ—এ ক্ষেত্রে সমস্যাটা কি তাই বুঝতে চেষ্টা করেছি, তার কোনও কাটা-ছাঁটা মীমাংসা করে দিতে সাহসী হই নি। আমি মানি যে পেটের ভাবনা অবশ্য আমাদের সর্ব্বপ্রধান না হলেও সর্ব্বপ্রথম ভাবনা কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি যে পেট যদি মস্তিষ্কের চালক হয়, তাতে পেটের কিছু লাভ হয় না, কিন্তু মস্তিষ্কের অশেষ ক্ষতি হয়। বাঙালী যে মারোয়াড়ি নয় এ দুঃখ আমরা আগেও করেছি। রামমোহন রায় ও রবীন্দ্রনাথের স্বজাতির সর্ব্বনাশ যে literary education-এর ফলে হয়েছে, এই বিশ্বাসের বলে আমরা তথাকথিত Scientific education-এর জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছিলুম। ফলে কলেজে একদল ছেলেদের গোড়াথেকেই একমাত্র বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত করা হল। সে শিক্ষার প্রসাদে আমরা কি লাভ করেছি? আমাদের আশা ছিল, যে ছেলেরা কাব্য দর্শন ইতিহাস ব্যাকরণ ত্যাগ করে বিজ্ঞান ধরলেই, এক কথায় লাইব্রেরী ছেড়ে ল্যাবরেটরিতে ঢুকলেই বঙ্গমাতা অন্নপূর্ণা হয়ে উঠবেন, অন্তত B. Sc.-দের ঘরে টাকা রাখবার আর জায়গা থাকবে না। কিন্তু আজ কি দেখতে পাচ্ছি?—দেশ 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' হয়ে ওঠা দূরে থাক, B. Sc.-র অন্নচিন্তা B. A-র চাইতে একচুলও কম নয়, এবং উভয়ের বাজার-দর এক, বড় বাজারেও, বৌ-বাজারেও।

আপনারা এই কথাটা স্মরণ রেখে শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা করবেন যে বাঙালী আসলে সরস্বতীভক্ত জাত এবং তারা যেদিন ভাবের চর্চ্চা থেকে বিরত হবে, সেদিন তারা তাদের স্বধর্ম্ম হারাবে। রামমোহন, রবীন্দ্রনাথের স্বজাতি কলকারখানা গড়তে না পারুক, তার চাইতে একটা ঢের বড় জিনিস গড়েছে এবং তার নাম হচ্ছে নব-ভারত।

নব-বিদ্যালয়।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণেষু—

ক্যাটালগ ঘাঁটা যাঁদের অভ্যাস আছে, তাঁরাই জানেন্ যে এমন সব বই আছে যার নাম পড়েই তা পড়তে লোভ হয়। আপনি আমাকে যে ফরাসী বইখানি পাঠিয়েছেন, সেখানি হচ্ছে ঐ জাতের। "নব-বিদ্যালয়", এই নাম পড়েই, এই বইয়ে অনেক নূতন সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করবার আশা আমার মনে জেগে উঠল; এবং শুনে সুখী হবেন যে, বইখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করে সে আশায় আমি নিরাশ হইনি। আমাদের দেশের স্কুলকলেজের প্রতি আমরা অনেকেই যে অসন্তুষ্ট; তার প্রমাণ ত আমাদের লেখায় বক্তৃতায় নিত্যই পাওয়া যায়। আমাদের স্কুলকলেজে আমাদের ছেলেরা যে মানুষ হচ্ছে না, এ কথা ত ঘরে-বাইরে দু'বেলা শুনতে পাই; কিন্তু কি করলে যে তা হবে, সে বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা বড় বেশি লোকের মাথায় নেই। তা যদি থাকত, তাহলে আমাদের এমন কথা শুনতে হ'ত না যে, ইংরাজি পড়েই বাঙালীর ম্যালেরিয়া হয়েছে। এর পর ছেলেদের স্কুলকলেজ ছাড়িয়ে আবার পাঠশালা ও টোলে পাঠাবার প্রস্তাব দেশহিতৈষী লোকেরা যে করবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? এ প্রস্তাব খুব পেট্রিয়টিক হতে পারে, কিন্তু মোটেই কাজের নয়; কেননা শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর হওয়ার একমাত্র উপায় যে পশ্চাৎপদ হওয়া, এ বিশ্বাস যাঁদের আছে তাঁরাও সে বিশ্বাস অনুসারে নিজেরা কাজ করতে প্রস্তুত নন। সভা-সমিতিতে স্কুলকলেজের উপর ঝাল ঝেড়ে আমরা নিজেদের ছেলেদের আবার সেই স্কুলকলেজেই পাঠাই। ফল কথা এই যে, যে ভাবে শিক্ষা চলছে সে ভাবে তা চলা উচিত নয়—এ কথা বলায় ততক্ষণ কোনই লাভ নেই, যতক্ষণ না কি করে তা

চালানো উচিত, সে কথা আমরা বলতে পারি। সে কথা যে আমরা বল্‌তে পারি নে, তার কারণ শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা যেমন অজ্ঞ তেমনি উদাসীন।

ইউরোপেও আজকাল সে দেশের সনাতন শিক্ষা-পদ্ধতির প্রতি অনেকেই অসন্তুষ্ট। সেই অসন্তোষের ফলে বেলজিয়ম, জর্ম্মাণী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে গুটি-কয়েক নব-বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই বইখানিতে এর মধ্যে একটি স্কুলের শিক্ষার প্রকরণ-পদ্ধতির আমূল বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এতে যা আছে তা মামুলি স্কুলের আনাড়ি সমালোচনা নয়। আসলে এতে সরকারি শিক্ষার এক বর্ণও সমালোচনা নেই। গ্রন্থকার স্বয়ং একটি নব-বিদ্যালয়ের স্রষ্টা এবং সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা। তিনি সুইট্‌জারল্যাণ্ডের শিক্ষকমণ্ডলী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে, তাঁর স্কুলের উদ্দেশ্য এবং কার্য্য সম্বন্ধে মুখে যে-সকল কথা বলেছেন, সেই সকল কথা একত্র করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন।

গ্রন্থকারের একটু পরিচয় দিই। ইনি ছিলেন বেলজিয়ামের নবইউনিভার্‌সিটির একজন অধ্যাপক। এঁর নাম Faria de Vasconcellos; শিক্ষাই এঁর ধর্ম্ম, শিক্ষাই এঁর কর্ম্ম, এবং স্বজাতির শিক্ষার উন্নতি-কল্পেই ইনি জীবন উৎসর্গ করেছেন। প্রফেসার ফারিয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বেলজিয়ামে ব্রিজ নামক গ্রামে তাঁর এই নব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। জর্ম্মাণরা বেলজিয়াম অধিকার করবার পর এ স্কুল বন্ধ হয়, এবং প্রফেসার ফারিয়া জেনেভায় নির্ব্বাসিত হন। তাঁর অপরাধ, তিনি বিশ্বমানবের সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন, এবং সেই বিশ্বাসের উপরেই তিনি তাঁর নবশিক্ষার পদ্ধতি গড়ে তোলেন। তাঁর মতে, এই যুগযুগান্তরের সভ্যতার ফলে মানুষ তার আদিম পশুত্ব হতে অনেকটা মুক্তিলাভ করেছে, এবং তাঁর দৃঢ় ধারণা যে মানুষের সঙ্গে মানুষের মারামারি কাটাকাটির মূলে যা আছে তা মানবধর্ম্ম নয়—পশুপ্রবৃত্তি। মানুষের অন্তরে তার আদিম হিংস্রতা আজও লুপ্ত হয় নি শুধু সুপ্ত হয়ে রয়েছে। যে শিক্ষার বলে মানুষের ভেদবুদ্ধি প্রবল হয়, সে শিক্ষার ফলে মানুষের আদিম পশুত্ব জেগে ওঠে; nationalism প্রভৃতি

কথার সাহায্যে ছেলেদের অন্তরে সেই সুপ্ত ব্যাঘ্রকেই জাগ্রত করে তোলা হয়; সুতরাং শিক্ষার মন্দির থেকে ও-সকল শব্দ বহিষ্কৃত করে দেওয়াই কর্ত্তব্য। তাঁর স্কুলের ছেলেদের মনে তিনি বিদেশী ও বিজাতির প্রতি মৈত্রীর ভাব উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন; তার ফলে তিনি বলেন, তারা মানুষ হয়েছে, কাপুরুষ হয় নি। প্রমাণ, শত্রুর আক্রমণ থেকে স্বজাতি ও স্বদেশকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর স্কুলের বড়ছেলেরা অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। নিজে পশু না হলে যে, পশুর বিরুদ্ধে দাঁড়ান যায় না—এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন, যদিচ অনেক বুদ্ধিমান লোকের মত তাই। বেলজিয়ামের উপর জর্ম্মাণী যে নিষ্ঠুর ও প্রচণ্ড আঘাত করেছে তাতে প্রফেসর ফারিয়ার উক্ত বিশ্বাস ঘা খেয়েছে—কিন্তু ভাঙ্গা দূরে যাক্ টলেও নি। যখন জর্ম্মাণরা সমগ্র বেলজিয়ামকে পদদলিত পীড়িত ও বিধ্বস্ত করছিল, সেই সময়ে তিনি জেনেভা সহরে এই কথা বলেন—

"এ দুর্দ্দিনেও মানবসভ্যতার প্রতি আমাদের আস্থা এবং শ্রদ্ধা সমান অটল রয়েছে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে,—ব্যক্তির উপরে, জাতির উপরেও, মানবাত্মা বলে একটি পদার্থ আছে। এই যুদ্ধের পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা ও বীভৎস অত্যারেও মানুষের আত্মার প্রদীপ কখনও নির্ব্বাপিত হবে না; সে অক্ষয় প্রদীপের চিরবর্দ্ধমান শিখা যুগের পর যুগে যত উর্দ্ধে আরোহণ করবে, বিশ্বমানবের জীবনের পথ তত আলোকিত হয়ে উঠবে।"

এর পর বোধহয় এ কথা স্পষ্ট করে বলবার দরকার নেই যে, প্রফেসার ফারিয়া একজন ঘোর Idealist; কিন্তু তার থেকে যদি কেউ মনে করেন যে তিনি একজন খেয়ালি লোক, এবং তাঁর স্কুল হচ্ছে একটি খামখেয়ালি ব্যাপার, তাহলে তিনি নিতান্তই ভুল করবেন। এই ছোট্ট বইখানির ভিতর তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে যে অগাধ জ্ঞান ও অসাধারণ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন, তা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। শিক্ষা জিনিসটে তিনি কবির চোখ দিয়েও দেখেন নি, দার্শনিকের চোখ দিয়েও নয়। সনাতন শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগই এই যে, সে পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক নয়, ও-হচ্ছে আসলে একটি

আন্দাজি ব্যাপার। প্রচলিত শিক্ষা, শিশু ও বালকের শরীর মন ও চরিত্রের সম্যক জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয় বলেই, সে-শিক্ষার রীতি হচ্ছে মনোজগতের অন্ধকারে ঢিল মারা। যে সত্য প্রমাণিত ও পরীক্ষিত, সেই সত্যের উপরেই তিনি তাঁর নবশিক্ষাপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর স্কুলে ছেলেদের দৈহিক মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হত, কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হত না। প্রফেসার ফারিয়া পাতায় পাতায় মানবাত্মার উল্লেখ করেছেন; কিন্তু মানবাত্মা বলতে তিনি বোঝেন—মানুষের সেই ব্যবহারিক আত্মা, যার পরিচয় পাওয়া যায় পৃথিবীর দর্শনে, বিজ্ঞানে, কাব্যে, আর্টে, শিল্পে, বাণিজ্যে, সমাজে ও রাষ্ট্রে। তদতিরিক্ত অপর আত্মার সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নীরব; সে আত্মার অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এ বিশ্বাস তিনি করেন্ যে সে বস্তুকে শিক্ষা দেওয়া—আর যারই হোক্—তাঁর সাধ্য নয়। অর্থাৎ—reality-র জ্ঞানের সাহায্যে দেহে মনে ও চরিত্রে সুস্থ সবল সক্রিয় ও সক্ষম মানুষ গড়ে তোলাই হচ্ছে তাঁর ideal, এবং একমাত্র এই ideal-এরই তিনি ভক্ত। এবং এই ধর্ম্মের সাধনপদ্ধতিই হচ্ছে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি।

(৩)

ইমারত গাঁথ্‌তে হলে মানুষের পক্ষে সব আগে তার গোড়াপত্তন করা আবশ্যক, এবং তার জন্য চাই জায়গা বাছা। প্রফেসার ফারিয়ার মতে যিনি একটি নববিদ্যালয় স্থাপন করতে চান, তাঁর প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে ঐ জায়গা বাছাই করা। এই সহজ কথাটা যে মানুষে প্রায়ই ভুলে যায়, তার পরিচয় ত আমরা নিত্যই পাই। আমরা যেখানে একটু ফাঁক পাই, সেইখানেই স্কুল বসিয়ে দিই। গাছ পোঁতবার সময়ও আমরা এর চাইতে ঢের বেশি সতর্ক হই; যেন গাছের জীবন মানুষের জীবনের চাইতে বেশি মূল্যবান।

প্রফেসার ফারিয়ার শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রথম সূত্র এই যে, স্কুলের উপযুক্ত স্থান হচ্ছে পল্লীগ্রাম, সহর নয়! সহর নামক ইঁটের পর্ব্বতের গুহায় আজন্ম বাস করে' মানবসন্তান যে, দেহ মন ও চরিত্রে পূর্ণ-শ্রী, পূর্ণ-শক্তি লাভ করবার সুযোগ

পায় না,—এ কথা আমরা ষোলআনা মানলেও অনেকে এক কড়াও মানেন না। খোলা আকাশের তলায় পরিষ্কার আলো ও বাতাসের মধ্যে বাস করাই যে ছোট ছেলের শরীরের পক্ষে স্বাস্থ্যকর ও মনের পক্ষে শ্রেয়স্কর, এ কথা বুঝতে যাঁদের দেরি লাগে, তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, তাঁরা কি স্বচ্ছন্দচিত্তে তাঁদের ছেলেদের খনির গর্ভে মানুষ হতে দিতে স্বীকৃত হবেন,—হোক্ না সে খনি বিজুলি বাতিতে আলোকিত আর বিজুলি পাখায় ব্যজনিত? ছোট ছেলের পক্ষে সহর একটি কারাগার মাত্র, সে কারাগারে আমরা যে তাদের বদ্ধ করে রাখতে কুণ্ঠিত হই নে, তার কারণ আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি হচ্ছে আসলে জেলের পদ্ধতি। সচরাচর স্কুল যে জেলখানার আদর্শেই গঠিত হয়, এ দুয়ের সাদৃশ্যের প্রতি নজর দিলে সকলেই তা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। এই জেলখানা থেকে ছেলেদের উদ্ধার করবার মানসেই ইউরোপে এই সব নব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। স্বাধীনতাই হচ্ছে এই সব স্কুলের মূলমন্ত্র; কেননা এদের কর্ত্তৃপক্ষেরা এই মহা সত্যের আবিষ্কার করেছেন যে, অবাধ স্বাধীনতার মধ্যেই মানুষ তার মনুষ্যত্ব লাভ করে, অর্থাৎ—ঐ অবস্থাতেই তার দেহ মন ও চরিত্রের পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়; এবং বলা বাহুল্য যে, ছোট ছেলেও মানুষ,—কেননা বৃদ্ধত্ব ও মানুষ্যত্ব এক বস্তু নয়। স্বচ্ছন্দে চলবার ফেরবার দৌড়বার লাফাবার জন্য ছেলেদের পক্ষে যে মাঠ চাই, এ কথা যে আজকাল অনেকেই মানেন তার প্রমাণ, সহুরে স্কুলও খেলার মাঠের জন্য লালায়িত। ছেলেরা কিন্তু শুধু জমির উপর ছুটোছুটি করেই সন্তুষ্ট থাকে না, তারা গাছে চড়্‌তে চায়, জলে নাম্‌তে চায়। একমাত্র স্থলচর হয়ে তাদের সুখ নেই, মাঝে মাঝে খেচর ও জলচর হতে পারলেই তারা আনন্দে থাকে। এ স্বাধীনতা তাদের দেওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সহরের খেলার মাঠে তারা সাঁতারও কাট্‌তে পারে না, ডালেও চড়্‌তে পারে না। সুতরাং স্কুল সেই জায়গাতেই হওয়া উচিত যেখানে মাঠ আছে, গাছ আছে, জল আছে।

আমরা সকলেই জানি যে, মানবজাতি তার শৈশবে প্রকৃতির কোলেই

লালিত পালিত হয়েছে ; সুতরাং মানব-শিশুর পক্ষে প্রকৃতির কোলেই মানুষ হওয়া স্বাভাবিক ;—কেননা যাঁরা ছোট ছেলের মনের খবর রাখেন তাঁরাই জানেন যে, আদিম মানবের সঙ্গে তাদের প্রকৃতির একটা মজ্জাগত মিল আছে। মানবজাতি যেমন প্রকৃতির সঙ্গে কারবার করে' যুগের পর যুগ ধরে দেখে এবং ঠেকে শিখে সভ্য হয়েছে, শিশুকেও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে মানুষ হতে হবে ; এই হচ্ছে নব-বিদ্যালয়ের স্রষ্টাদের মত। প্রকৃতির হাত ধরে এবং প্রকৃতিকে হাতে ধরেই মানুষের মন যে সজ্ঞান এবং সক্রিয় হয়ে ওঠে, এই বিশ্বাসের বলেই নব-বিদ্যালয়ের নব-শিক্ষাপদ্ধতি রচিত হয়েছে। যখন মানসিক শিক্ষার অধ্যায়ে এসে পড়ব, তখন সে পদ্ধতির নূতনত্ব ও সার্থকতার পরিচয় দেব। এস্থলে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, শিক্ষার এই নব-পন্থীদের মতে সহুরে স্কুলে তাঁদের পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া একেবারেই অসম্ভব, সুতরাং স্কুলের স্বস্থান হচ্ছে সহরের বাইরে।

স্কুলের আস্তানা সহরের বাইরে হলেও বহুদূরে হওয়া উচিত নয়—এই হচ্ছে প্রফেসার ফারিয়ার মত। তাঁর স্কুল ব্রাসেল্স্ থেকে পঞ্চাশ মিনিটের রেলের পথ। স্কুল যে একটি বড় সহরের এক ঘণ্টার রেলপথের বাইরে হওয়া উচিত নয়—এ বিষয়ে তিনি দৃঢ়মত। এ অবশ্য একটি নূতন কথা, সুতরাং এ বিষয়ে তাঁর কি বক্তব্য আছে শোনা যাক্। তিনি বলেন—

"লোকালয়ের বাইরে স্কুল স্থাপনা করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, আমরা ছেলেদের একটা বড় সহরের সংস্পর্শ থেকে একেবারে দূরে রাখতে চাই, কিম্বা রাজধানী নামক সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে মানুষের হৃদয়মনের শিক্ষার জন্য যে অতুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত রয়েছে, টলষ্টয়ের মত তা প্রত্যাখ্যান করতে চাই। এ কথাটা আমি খুব স্পষ্ট করে খুব উঁচু গলায় বলতে চাই যে, এই প্রকৃতির কোলে ফিরে আসার অর্থ আমাদের কাছে এ নয় যে, আমরা বনবাসের কোনরূপ অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য কিম্বা দৈবী-শক্তিতে বিশ্বাস করি। সেরকম অদ্ভুত বিশ্বাস যে আমাদের নেই—এ কথাটা পরিষ্কার করে বলা আবশ্যক, কেননা

প্রায়ই দেখতে পাই যে এমন লোক ঢের আছেন যাঁদের ধারণা যে আমাদের নব-বিদ্যালয়ের প্রধান গুণই এই যে, আমরা সহরের সয়তানের বেড়াজাল ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছি। লোকালয়-বহির্ভূত মাঠের মধ্যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করবার সুফল যে কি, তা পূর্ব্বেই বলেছি, কিন্তু সহরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখবার সুফল থেকেও আমরা ছেলেদের বঞ্চিত করতে চাই নে।"

আমাদের ভাষায় বলতে হ'লে, ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ যে একই আশ্রম, প্রফেসার ফারিয়া এ কথা মানেন না। তাঁর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে সংসার থেকে পালাতে শেখানো নয়, তার জন্য তাকে প্রস্তুত করা। প্রথম আশ্রমের সার্থকতা হচ্ছে মানুষকে তার দ্বিতীয় আশ্রমের উপযোগী করায়। স্কুল সন্ন্যাসীর আশ্রমও নয়, ভিক্ষুর মঠও নয়। এঁদের মতে বিদ্যালয় হচ্ছে সংসার-রঙ্গালয়ের নেপথ্যশালা। জীবন নাটকের অভিনয় সকলকেই করতে হবে, সে নাটক ট্রাজেডিই হোক্ আর কমেডিই হোক; সেই অভিনয় ভাল ক'রে সুন্দর ক'রে করতে শেখানোটাই হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য; সুতরাং সে শিক্ষাশালা প্রথমে নেপথ্যেই রাখা দরকার। শিক্ষানবিশীর যুগে সামাজিক জীবনের যবনিকার অন্তরালে যাবার এও একটা কারণ।

এখন দেখা যাক্, সহরের সঙ্গে স্কুলের সম্পর্কটা নিকট হওয়ায় ছেলেদের কি লাভ। মানুষের যুগযুগান্তরের জ্ঞানকর্ম্মের ফল প্রতি দেশে বড় বড় সহরেই সঞ্চিত রয়েছে; তারপর যে উপাদানের সাহায্যে জ্ঞান ও কর্ম্ম বৃদ্ধি লাভ করে, সে উপাদানও ঐ বড় বড় সহরেই সংগৃহীত হয়। একটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করা দরকার। এই নব-শিক্ষার প্রধান অবলম্বন হচ্ছে বস্তু—বই নয়। নব-বিদ্যালয়ে বইয়ের শিক্ষা ছেলের বস্তুজ্ঞানের অনুসরণ করে। এই কারণেই Museum, Zoo, Botanical Gardens প্রভৃতিতে নব-বিদ্যালয়ের ছেলে-দের ঘন ঘন যাতায়াত করতে হয়, এবং বলা বাহুল্য এ সব জিনিষ বড় সহরেই থাকে—পাড়াগাঁয়ে থাকে না। তারপর নব-শিক্ষকের দল, ছেলেদের ভাল ছবি দেখানো এবং কনসার্ট শোনানো তাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান এবং

সহৃদয়তার অনুশীলনের জন্য একান্ত প্রয়োজন মনে করেন, এবং উঁচুদরের ছবি দেখতে হলে, উঁচুদরের গানবাজনা শুনতে হলে, সহর ব্যতীত গত্যন্তর নেই। দেশের বড় বড় বক্তাদের বক্তৃতা শোনাও এঁদের মতে শিক্ষার একটি প্রধান উপায়। ছেলেরা বড় হলে যে-সামাজিক জীবনে প্রবেশ করবে, সেই সমাজিক জীবনের সকল উচ্চ অঙ্গের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই তাদের সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার। ছাপার অক্ষরের ভিতর দিয়ে সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় না। সংক্ষেপে, প্রফেসার ফারিয়ার বক্তব্য এই যে, একদিকে যেমন সামাজিক জীবনের যত কিছু কদর্য্যতা ও হীনতা সহরে পুঞ্জীভূত হয়েছে, অপর দিকে তেমনি সে জীবনের যত কিছু সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব ঐ সহরেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সুতরাং সহরের পাপ ও কদর্য্যতা থেকে ছেলেদের দূরে রাখবার জন্য ছেলেদের সহরের বাইরে রাখা যেমন দরকার, সভ্যতার মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ করবার জন্য ছেলেদের সহরের সন্নিকটে রাখাও তেমনি দরকার।

আর এক কথা। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, স্বাধীনতাই হচ্ছে নব-বিদ্যালয়ের মূলমন্ত্র। তাই এ শ্রেণীর স্কুলের শাসনতন্ত্র হচ্ছে স্বায়ত্ত-শাসন। স্কুলের শাসনসংরক্ষণ সবই ছেলেদের হাতে, এমন কি ছেলেদের পঞ্চায়তে মাষ্টারদের কোনই স্থান নেই। প্রফেসার ফারিয়া এই ছাত্রশাসনতন্ত্রের লম্বা বর্ণন করেছেন। সে সব কথা বারান্তরে বলব। এ ক্ষেত্রে এইটুকু বলা দরকার যে, স্বায়ত্ত-শাসন বজায় রাখবার জন্য স্কুলের পক্ষে সহরের কাছ ঘেঁসে থাকা দরকার। কেনাকাটি হাটবাজার ত ছেলেদেরই করতে হয়, তা ছাড়া দরকার পড়লে উকীলের পরামর্শ, এঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ নেওয়া প্রভৃতি প্রাপ্ত বয়স্ক লোকদের কাজও ছেলেদেরই করতে হয়। সহরের বিরাট কর্ম্মজীবনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, এবেলা ওবেলা তাদের সহরে যাতায়াত করতে হয়। স্কুলের বিষয়কর্ম্মের ভার ছেলেদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য তাদের স্বাবলম্বন শেখানো।

(৪)

এই নব-বিদ্যালয়ের আর একটি নিয়ম আছে, যেটি আমার কাছে ভারি নূতন লাগল। এ স্কুল অবশ্য বোর্ডিং স্কুল, কিন্তু তা হলেও এ স্কুলে সস্ত্রীক হেডমাষ্টার ছাড়া অপর কোনও মাষ্টারকে থাকবার স্থান দেওয়া হয় না। এর প্রথম কারণ, এ স্কুল পরিবারের আদর্শে গড়া। ছেলেরা এ স্কুলে যথার্থই গুরু-গৃহে বাস করে, গুরু এবং গুরুপত্নীই তাদের পিতৃমাতৃস্থানীয়। সংসারে আমরা যেমন এক পরিবারের ভিতর আর এক পরিবারকে স্থান দিতে স্বতঃই নারাজ—কেননা ও-দুয়ে ভাল করে খাপ খাওয়ানো যায় না; তেমনি এই নব-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা একের বেশি গুরুকে সেখানে স্থান দিতে নারাজ—কেননা, এই পারি-বারিক স্কুলে নানা গুরুকে একত্র রাখলে তাদের পরস্পরকে খাপ খাওয়ানো যায় না। প্রফেসার ফারিয়া বলেন, পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার ফলেই তিনি এই নিয়ম করতে বাধ্য হয়েছেন। একাধিক মাষ্টারকে একান্নবর্ত্তী করবার ফলে দুটি একটি নব-বিদ্যালয় ভেঙ্গে গেছে। অনেক সন্ন্যাসীতে যে গাজন নষ্ট হয়—এ হচ্ছে তাঁর কাছে পরীক্ষিত সত্য। তাঁর বিশ্বাস পাঁচটি মাষ্টারকে একত্র রাখলে তাঁদের ভিতর দলাদলির সৃষ্টি হতে বাধ্য। এ বিষয়ে ভাললোক মন্দলোকের কোন কথা নেই। মানুষ যতই ভাল হোক না, তার ধাত বলে একটা জিনিস আছে, এবং অনেক স্থলে মতে মিললেও, পাঁচজনের ধাতে মেলে না। এবং পাঁচজনে যত কাছাকাছি যত ঘেঁসাঘেঁসি করে থাকে, তাদের পরস্পরের ধাতু-বৈষম্য তত ফুটে ওঠে। প্রফেসার ফারিয়া বলেন, যে ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিদ্বেষ প্রকাশ্য-বিরোধে না দাঁড়ায়, সে ক্ষেত্রে তা প্রচ্ছন্ন অবস্থায়ই থাকে এবং প্রচ্ছন্ন বিষের মত তা অলক্ষিতে স্কুলদেহকে জর্জ্জরিত করে। এই কারণে স্বয়ং প্রফেসার ফারিয়া ব্যতীত তাঁর স্কুলের সকল মাষ্টারই ব্রাসেল্‌সে বাস করতেন—অতএব ব্রাসেল্‌স হাতের গোড়ায় না থাকলে এ স্কুল চলত না।

যদি বলেন, যে-গাঁয়ে স্কুল সেই গাঁয়েই মাষ্টারদের আলাদা বাসা করে দিলেই ত হত, ব্রাসেল্‌স পাঠাবার কি দরকার ছিল?—তার উত্তর, তাঁর নব-

বিদ্যালয় ক্রোরপতির স্কুল নয়। এদের নব-শিক্ষাপদ্ধতি কার্য্যে পরিণত করবার জন্য নব-বিদ্যালয়ে বহু মাষ্টার এবং অতি উঁচুদরের মাষ্টার চাই—কেননা প্রফেসার ফারিয়া বলেন, স্কুলের ভালমন্দ, যারা তা চালায় তাদেরই উপর নির্ভর করে, নিয়মাবলীর উপর নয়। তাঁর ৩৫টি ছেলের স্কুলে ১৭টি মাষ্টার ছিল, এবং এঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিষয়ে এক একটি গণ্যমান্য ব্যক্তি। স্কুলের তহবিলে লাখ দুলাখ টাকা না থাকলে এ দরের মাষ্টারদের সব বাঁধা-মাইনের চাকর করে রাখা যায় না। এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই ব্রাসেল্‌স বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। হপ্তায় একদিন আধদিন এসে এঁরা ছেলেদের শিক্ষা দিয়ে যেতেন। এ কাজ তাঁরা আহ্লাদের সঙ্গেই করতেন, কেননা সহরে ছদিন সকাল সন্ধ্যে কাজ করে একদিন গাছপালা ফুলফলের দেশে গিয়ে দিনমান ছোট ছেলেদের নিয়ে কাটানতে এঁরা অতিশয় আনন্দ বোধ করতেন। এই পালায় পালায় পড়ানতে স্কুলের কোনই ক্ষতি হত না; কেননা নব-বিদ্যালয়ে একদিনে পাঁচ বিষয় পড়াবার নিয়ম নেই। একদিনে একটি, বড় জোর দুটি বিষয় পড়ানো হয়, তার বেশি নয়।

আজ এই পর্য্যন্ত। ক্রমে অবসর মত, এই নব-বিদ্যালয়ের সবিশেষ পরিচয় দেব।

নব-বিদ্যালয় (২)।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণেষু

(৫)

আজ আমি শরীরচর্চ্চা সম্বন্ধে নব-বিদ্যালয়ের প্রকরণ-পদ্ধতির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব। আগে থাকতেই বলে রাখি, এ পত্রে মূলের চাইতে টীকাভাষ্য ঢের বেশি হবে, কেননা শরীরের কথাটা এদেশে শুধু বিদ্যালয়ের কথা নয়— লোকালয়েরও কথা। ছেলেবেলায় যে ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে আমরা মানুষ হয়েছি, তাঁর ওষুধের প্রতি শিশির গায়ে, একালের অনেক ওষুধের শিশির গায়ে যেমন বড় বড় লাল হরফে poison ছাপানো থাকে, তেমনি বড় আর তেমনি লাল হরফে ছাপানো থাকৃত, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"। এ বচন শাস্ত্রীয় কি উদ্ভট তা জানিনে, কিন্তু ঐ ক'টি কথা আমার মনের মধ্যে একেবারে লাল কালিতে ছেপে গিয়েছে, তার কারণ দশ থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত, এই চার বৎসর ধরে ঐ বাক্যটি আমার চোখের সুমুখে প্রতিনিয়ত ছিল।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"—এ ধর্ম্মজ্ঞান আজ দেশসুদ্ধ লোকের মনে জন্মেছে। তবে উক্ত ধর্ম্মের সাধন-পদ্ধতি যে কি, সে বিষয়ে আমাদের তেমন স্পষ্ট ধারণা নেই। নিত্যনিয়মিত ওষুধ খাওয়া যে বলাধানের সদুপায় নয়— এ সম্বন্ধে বোধহয় এক ঔষধবিক্রেতা ছাড়া আর সকলেই একমত। কিন্তু সদুপায়টা যে কি, তা জানবার জন্য শারীর-বিজ্ঞানের কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয় করা প্রয়োজন। আমি 'কিঞ্চিৎ' বিশেষণটি ইচ্ছে করেই লাগিয়েছি, কেননা এক্ষেত্রে সাধারণ জ্ঞানের মূল্য বিজ্ঞানের চাইতে নিতান্ত কম নয়।

নব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের মতে, আজকালকার ভাষায় যাকে বলে দেহের অনুশীলন—তার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহের শক্তি ও সৌন্দর্য্য সাধন করা।

সৌন্দর্য্য জিনিষটে যে শক্তির উপর নির্ভর করে, এ বিষয়ে সকল প্রাচীন সভ্যতাই একমত। রূপ—তা সে দেহেরই হোক্ আর মনেরই হোক্, ভাবেরই হোক্ আর ভাষারই হোক্—আকারের উপরেই যে নির্ভর করে, এবং আকারের সঙ্গতি ও সৌষ্ঠব যে স্বাস্থ্য ও বলের উপরেই নির্ভর করে, এই হচ্ছে ক্লাসিক মত।

দেহের শক্তি ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলাই যে দেহচর্চ্চার মুখ্য উদ্দেশ্য—এ-কথা এ-কালেও বোধহয় বেশির ভাগ লোক স্বীকার করেন। অতএব সে উদ্দেশ্যসাধনের সদুপায় কি, এই হচ্ছে শিক্ষার প্রথম সমস্যা। কেননা এ পৃথিবীতে দেহই হচ্ছে প্রাণের ভিত্তি।

নব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের মতে, এর সর্ব্বপ্রধান উপায় হচ্ছে ছেলেদের স্নান আহার নিদ্রার একটা সুব্যবস্থা করা। প্রথমে ঘুমের কথাটাই ধরা যাক্।

নব-বিদ্যালয়ে ছেলেদের নয় থেকে এগারো ঘণ্টা পর্য্যন্ত একটানা ঘুমতে দেওয়া হয়। তাঁদের মতে এর কম হলে ছেলেদের স্বাস্থ্য বজায় থাকে না। দিনে যদি ভাল করে জেগে থাকতে হয়, তাহলে রাত্তিরে যে ভাল করে ঘুমনো দরকার, এ বিষয়ে আমি নিজে সাক্ষী দিতে পারি। রাত জেগে পড়ার ফলে ছেলেরা যে দেহমনে ঝিমিয়ে পড়ে, এই প্রত্যক্ষ সত্যকে অগ্রাহ্য না করলে—বাঙালী জাতটা আমার বিশ্বাস এর চাইতে ঢের বেশি সজাগ হতে পারত।

তারপর নব-বিদ্যালয়ে ছেলেদের শোবার ঘরের দুয়োর-জানালা কখনও বন্ধ করা হয় না। এ বিষয়ে শীতগ্রীষ্মের কোনও তফাৎ নেই। আমাদের এই গরম দেশে আমরা শুধু দরজা-জানালা নয়—শার্শি পর্য্যন্ত এঁটে শুই; ঠাণ্ডা লাগবার আমাদের এতই ভয়। কিন্তু রুদ্ধ-ঘরের বদ্ধ-বায়ুর ভিতর মানুষ হওয়ায় আমাদের ছেলেমেয়েদের বাল্যে সর্দ্দিকাশি কামাইও যায় না, কমও হয় না; তারপরে যৌবনে হয় তাদের ক্ষয়কাশ। বাঙলাদেশের এই

রাজধানীতে রাজযক্ষ্মার প্রতাপ,—বিশেষত মেয়েমহলে,—যে দিনের পর দিন কি রকম বেড়ে চলেছে, তার সন্ধান যে-কোনও ডাক্তার-কবিরাজের কাছে পাবেন। অবরোধ-প্রথায় যে মানুষের শ্বাসরোধ করে, তার প্রমাণ আমাদের ঘরে ঘরে পাওয়া যায়। আলো-হাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে শুধু মানুষ মারবার জন্য,—এরূপ বিশ্বাস করায় ভগবানের উপরেও সুবিচার করা হয় না, নিজের বুদ্ধিরও পরিচয় দেওয়া হয় না। দুয়োর বন্ধ করলেই যে মানুষে তার ভিতর বন্দী হয়—এ জ্ঞান থাকলে, আমরা আমাদের বাসাগারকে কারাগার করে তুলতুম না। বাহিরকে বাহির করে রাখলেই ঘর হয়ে পড়ে কবর। দিবারাত্র খোলা হাওয়ার ভিতর বড় হলে, শরীর যে কত সুস্থ ও কত বলিষ্ঠ হয়, তার পরিচয় ঐ নব-বিদ্যালয়েই পাওয়া গেছে। অধ্যাপক ফারিয়া বলেন যে, তাঁর স্কুলের ছেলেরা এক বৎসর দ্বার-মুক্ত ঘরে ঘুমতে অভ্যস্ত হবার ফলে, তাদের শীতগ্রীষ্ম সহ্য করবার শক্তি এতটা বেড়ে গেছে যে, তাদের মধ্যে অনেক, দেশ যখন বরফে জমে যায়, সে সময়ও রাত্তিরে সখ করে মাঠের ভিতর তাঁবু খাটিয়ে তার নীচে শোয়, এবং তাতে তাদের নিউমোনিয়া ত বড় কথা—শ্লেষ্মাও প্রকুপিত হয় না। এ একটা কম বড় শিক্ষা নয়; কেননা সকলেই জানেন যে, অকাতরে শীতগ্রীষ্ম সহ্য করবার শক্তির নামই তিতিক্ষা। আর যাতে করে *তিতিক্ষা* আমাদের অঙ্গের ভূষণ হয়, তার জন্য ত সকলেই চীৎকার করছেন।

আর একটি কথা। নব-বিদ্যালয়ের ছেলেদের গ্রীষ্মকালে দিনে ঘুমতে দেওয়া হয়। সে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের "মা দিবাং স্বপ্নী" এ নিষেধ মেনে চল্‌তে হয় না। তার কর্ত্তৃপক্ষদের মতে ছেলেদের পক্ষে শুধু গ্রীষ্মকালে নয়, সকল কালেই, দিনে অন্তত খানিকক্ষণের জন্য চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা নিতান্ত দরকার, নচেৎ বড় হলে তারা পুরোপুরি খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না। অস্থিতত্ত্ব-বিদেরা আবিষ্কার করেছেন যে, বারো চৌদ্দ বয়েসের আগে ছেলেদের পিঠের দাঁড়া মজবুত হয় না, সুতরাং সে বয়েসে দিনভর দেহের বোঝা বইতে হলে তাদের মেরুদণ্ডটা বেঁকে যায়, নুয়ে পড়ে। অধিকাংশ

লোকের পৃষ্ঠদণ্ড যে ঋজু নয়, তা সভ্যসমাজের দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌লেই নজরে পড়ে। দেহের এরূপ বঙ্কিম ভঙ্গীটা সুদৃশ্য ত নয়ই, স্বাস্থ্যকরও নয়! আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা পৃষ্ঠদণ্ডকে ঋজু করা এতই আবশ্যক মনে কর্‌তেন যে, তার জন্য তাঁদের হঠযোগের সব ভীষণ প্রক্রিয়া অভ্যাস কর্‌তে হ'ত। সময় থাক্‌তে দিনদুপুরে একটু শুয়ে নিলে যদি সেই সুফল লাভ করা যায়, তাহলে তা যে করা কর্ত্তব্য এ বিষয়ে আশা করি দ্বিমত নেই।

(৬)

নিদ্রার পরই ওঠে আহারের কথা। কথায় বলে—"আহারনিদ্রা" যত বাড়াও তত বাড়ে। এ কথার অর্থ—ও-দুই কমানো সমান কর্ত্তব্য। নব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা এর প্রথম অংশ গ্রাহ্য করেন, শেষ অংশ করেন না। তাঁদের মতে ছেলেরা যত ঘুমোয় ঘুমক, কিন্তু তাদের ভোজনের একটা সীমা নির্দ্ধারণ করে দেওয়া কর্ত্তব্য। সভ্যসমাজের বেশির ভাগ লোক যে মরে অতি ভোজনের ফলে,—উপবাসে নয়,—এ জ্ঞান যদি সাধারণ লোকের থাক্‌ত, তাহলে পৃথিবীর রোগ সোক অনেকটা কমে আস্‌ত। আমাদের দেশে এ জ্ঞানের বিশেষ দরকার আছে, কেননা আমরা আর যাই হই, জাত হিসেবে মিতাহারী নই। ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদের পেটের মধ্যেই পাওয়া যায়। আর্য্য মুসলমান ও ইংরাজের, আর কিছু না হোক, আহার আমরা যুগপম্পরায় উদরস্থ করেছি। কাঁচকলা সিদ্ধ আদি করে কোপ্তা কাবাব চপ কাটলেট সবই আমাদের সমান ভক্ষ্য। পেটে খেলে পিঠে সয়, এ প্রবাদের জন্ম বাঙলাদেশে। অনেকে বলেন যে এতে বাঙালী জাতি তার assimilation শক্তির পরিচয় দেয়; শুধু তাই নয়, যারা স্বদেশী ডাল রুটির সাহায্যে জীবন ধারণ করে, তাদের আমরা ছাতুখোর বলে অবজ্ঞা করি। আমাদের রসনা বিদেশী ভাষা যেরূপ অনায়াসে আত্মসাৎ করে, আমাদের উদর বিদেশী আহারও তদ্রূপ অনায়াসে আত্মসাৎ করে।

নানা প্রকারের চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের রসাস্বাদন করায় সম্ভবত ক্ষতি

নেই, কিন্তু তার পরিমাণ একটা সীমার ভিতর আবদ্ধ রাখা স্বাস্থ্যনীতির হিসেবে নিতান্ত প্রয়োজন। Assimilation-এর শক্তি তার প্রবৃত্তির সঙ্গে খাপে খাপে মিলে যায় না। জীর্ণ করবার শক্তির চাইতে আমাদের ভোজন করবার প্রবৃত্তি ঢের বেশি হওয়ায়, বাঙালার যুবকদের হয় মন্দাগ্নি, আর প্রৌঢ়-দের বহুমূত্র। বহু লোকের দেখ্‌তে পাই একটা ধারণা আছে যে, ও-দুই রোগের দ্বারা বাঙালী তার চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়। সে ধারণা নিতান্তই ভুল। উদর ও মস্তিষ্ক এক অঙ্গ নয়, এবং এক প্রকৃতির অঙ্গ নয়। এর একটি নিরেট, আর একটি ফাঁপা; অতএব এ দুয়ের ক্ষুধাও এক নয়, খোরাকও এক নয়। এর অধমটির খোরাক কম জোগ্যালে উত্তমটির শক্তি বাড়ে। আমার বিশ্বাস এই ঔদরিকতাই আমাদের সকল দুর্ব্বলতার মূল কারণ। আমরা জাতকে জাত যে এতটা স্ত্রী-শাসিত—সেও ঐ পেটের দায়ে। শুন্‌তে পাই অপর দেশের স্ত্রীলোকে পুরুষদের হৃদয় তুষ্ট করে তাদের পোষ মানায়—কিন্তু দেখ্‌তে পাই এদেশের স্ত্রীজাতি পুরুষদের উদর পুষ্ট করে তাদের বাগ মানায়। রন্ধনই এ দেশে দম্পত্যের প্রধান বন্ধন! এই সব কারণে, আমার মতে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের আহার-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করা দরকার; এবং এ শিক্ষা স্কুল থেকে সুরু হওয়াই কর্ত্তব্য। বাল্যকালে অপরিমিত আহার কর্‌লে, যৌবনে দুষ্ট ক্ষুধাকে আর শিষ্ট করা যায় না।

দেশভেদে জাতির খাদ্যাখাদ্যের ভেদ হয়। সুতরাং বেলজিয়ামের স্কুলের আহারের ব্যবস্থা আমাদের স্কুলে নাও চল্‌তে পারে; তবে আমরা যখন সর্ব্বভূক, তখন এই কথাটা আমাদের জানা দরকার যে, নব-বিদ্যালয়ে ছেলেদের মাংসভক্ষণ নিষেধ। এ স্কুলে দুধ ঘি আটা, ফল মূল ও শাক্ সবজিই ছেলেদের প্রধান আহার।

(৭)

নব-বিদ্যালয়ে স্নান প্রাতঃকৃত্য এবং সায়ংকৃত্য। সেখানে ছেলেদের দিনে দুবার নাইতে হয়, সকালে ঘরে ও বিকালে পুকুরে। বারোমাস সকলের

পক্ষে ঠাণ্ডা জলেরই ব্যবস্থা। গরম জল ওষুধের মত ডাক্তারের প্রিস্‌ক্রিপ্‌সান ব্যতীত কাউকে ব্যবহার কর্‌তে দেওয়া হয় না। সাঁতার-কাটার সুফলে এঁদের বিশ্বাস এত অগাধ যে, সকল ছেলেকেই সাঁতার শিখ্‌তে হয়, এবং নিত্য অভ্যাস করতে হয়। এক সহুরে ছাড়া এদেশের আর সকল ছেলেদের অবগাহন-স্নান একটা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম, সুতরাং এ বিষয়ে এঁদের কাছে আমাদের কিছু শেখবার নেই—একটা জিনিস ছাড়া; নব-বিদ্যালয়ের ছেলেদের নেয়ে উঠে গা মুছতে দেওয়া হয় না! রোদে হাওয়ায় তাদের গায়ের জল গায়েই শুকোয়। অর্থাৎ—তাদের দেহ থেকে এক ভূতকে আর দুই ভূত দিয়ে তাড়ান হয়,—এতে নাকি সে দেহের পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাবার সম্ভাবনা অনেকটা কমে আসে। ছেলেরা যাতে করে পুরোদস্তুর sun-dried হয়, তার জন্য স্নানান্তে তাদের দিগম্বর অবস্থায় থাক্‌তে হয়, কেননা এ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের বিশ্বাস যে, শরীরের কোন অঙ্গকেই অষ্টপ্রহর অসূর্য্যম্পশ্য করে রাখা সঙ্গত নয়। এ কথাটার বিশেষ করে উল্লেখ করবার কারণ, সমাজ-দেহের অর্দ্ধাঙ্গকে অসূর্য্যম্পশ্য করে রাখায় সে দেহ যে সুস্থ থাকে, এ বিশ্বাস কোন কোনও জাতের আছে। সেই সর্ব্বনেশে ধারণাকে দূর কর্‌তে হলে, আলো-হাওয়ায় গুণকীর্ত্তন ফাঁক পেলেই করা উচিত! ডোরকৌপীন ধারণ কর্‌লে রক্তমাংসের শরীর যে ইস্পাত হয়ে ওঠে, তার কারণ সে শরীরকে রোদে পুড়িয়ে জলে ডোবানো হয়।

স্নান, আহার, নিদ্রা—এ সকলের কাজ হচ্ছে শরীর রক্ষা করা। শরীরকে বলিষ্ঠ ও সক্রিয় করবার জন্য আরও পাঁচরকম উপায় অবলম্বন কর্‌তে হয়! সে সকল উপায় মোটামুটি চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(১) খেলা।

(২) দৌড় ঝাঁপ (Sports)।

(৩) ব্যায়াম (Gymnastics)।

(৪) কাজ।

খেলা সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে, যে শিশু যত খেলতে ভালবাসে, সে শিশু তত সুস্থ। সুতরাং তার খেলায় বাধা দেওয়ার অর্থ তার দেহমনের শক্তির স্ফূর্ত্তিতে বাধা দেওয়া। শিশুরা দেহের শক্তি ব্যয় করেই যে তা সুদসুদ্ধ আদায় করে, এ কথা জ্ঞানী মাত্রেই জানেন। কিন্তু খেলে বেড়ালে মনেরও যে উপকার হয়, সে বিষয়ে সকলে নিঃসন্দেহ নন। অথচ ওদিকে একটু মনোযোগ করলে সকলেই দেখতে পাবেন যে, খেলার ভিতর বুদ্ধি খেল্‌বার ঢের অবসর আছে। এমন একটা খেলার দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্—যা পৃথিবীর সকল দেশের সকল ছেলেরাই যুগ যুগ ধরে খেলে আস্‌ছে। লুকোচুরি খেলা হচ্ছে বিশ্ব-শিশুর নিত্য লীলা। বলা বাহুল্য এ খেলার প্রসাদে অনুসন্ধিৎসা গবেষণা, সমীক্ষা পরীক্ষা, দিগ্‌দর্শন পরিদর্শন প্রভৃতি মহামূল্য চিত্তবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন হয়। বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কারের জন্য এ ক'টি ছাড়া আর কোন্ চিৎশক্তির প্রয়োজন হয়?—সত্যকথা বল্‌তে, পৃথিবীর মহা মহা বৈজ্ঞানিক দার্শনিকেরা সত্যের সঙ্গে লুকোচুরি ছাড়া আর কি খেলছেন? ছেলেবেলায় ছেলেদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে লুকোচুরি খেল্‌লে, আমরা বড় হলে বিশ্বের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে লুকোচুরি খেলতে পারব। যাঁরা দর্শনবিজ্ঞানের ধার ধারেন না, তাঁদের পক্ষেও এ খেলায় অভ্যস্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সামাজিক জীবনে মানুষে লুকোচুরি ছাড়া আর কি খেলে? রাজায় প্রজায়, প্রভু ভৃত্যে, স্ত্রী পুরুষে চিরদিন ত ঐ খেলাই খেলে আস্‌ছে; অতএব দাঁড়াল এই যে, শিশুদের খেলায় বাধা দেওয়া শিক্ষকের পক্ষে অকর্ত্তব্য। তারপর তাদের কোনরূপ খেলা শেখানোও শিক্ষকের কর্ত্তব্য নয়। অধ্যাপক ফারিয়া বলেন, শিশুদের খেলা একটু লক্ষ্য করে দেখলেই দেখা যায় যে, তারা নিত্য নতুন খেলা খেলে। তারা কল্পনা রাজ্যের অধিবাসী বলে, এ বিষয়ে তাদের উদ্ভাবনী শক্তি অসীম। তাদের কল্পনাকে তারা এবেলা ওবেলা খেলার রাজ্যে বাস্তব করে তোলে। এতেই তাদের আর্টিষ্টিক শক্তির চরিতার্থতা। সুতরাং খেলার ক্ষেত্রে তাদের একেবারে ছেড়ে না দিলে আমরা যে তাদের শরীরকে জখম

করি, শুধু তাই নয়,—সেই সঙ্গে তাদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে ভোঁতা করি—আর্টিষ্টিক শক্তিকে চেপে দিই। এ সব কথা যদি সত্য হয়, তাহলে :—

উঠ শিশু মুখ ধোও, পর নিজ বেশ,
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ”

এই শ্লোকটি হইতে “পাঠেতে” শব্দটি বহিষ্কৃত করে দিয়ে তার স্থলে “খেলায়” বসিয়ে দেওয়া সঙ্গত। ভোরের বেলায় শিশুরাও যদি সাদা কাগজের উপর কালির আঁচড়ের প্রতি মনোনিবেশ করে, তাহলে কার জন্যই বা “পাখী সব করে রব” আর কিসের জন্যই বা “কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল”? রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে বলে কি শিক্ষকদেরও শিশুর পাল লয়ে যেতে হবে স্কুলে? Analogy-র বলে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হলে যে উল্টো উৎপত্তি হয়, তার প্রমাণ—স্কুলেও পাঁচন বলে। নব-বিদ্যালয়ে সব রকমের গাছপালা আছে,—শুধু বেত নেই। সে যাই হোক্‌, ভগবানের সৃষ্টির সকল জিনিসের ভিতর যে একটা যোগাযোগ আছে—সে জ্ঞান আমরা হারালেও, শিশুরা হারায় না; তাই তারা আলো বাতাস পাখী ফুল সকলের সঙ্গে যোগ রেখেই আনন্দ পায়, আর সেই আনন্দই তাদের জীবনীশক্তিকে বিকশিত করে।

(৯)

এ ত গেল খেলার প্রথম অধ্যায়। শিশুর চরিত্র সম্পূর্ণ স্বাধীন, সুতরাং তার খেলাও সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ।

বালকের খেলার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শিশুর খেলা ব্যক্তিগত, বালকের খেলা সামাজিক। শৈশব অতিক্রম করবার পর ছেলেদের মনে যখন সমাজের জ্ঞান জন্মায়—তখন তারা দলবদ্ধ হয়ে খেলে। এ সব খেলার আগাগোড়া ধরাবাঁধা নিয়ম আছে। টেনিস, ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি হচ্ছে সব সামাজিক খেলা—অর্থাৎ দশে মিলে নিয়ম মেনে এ সব খেলা খেলতে হয়। এ সব খেলার প্রধান গুণ যে এতে ছেলেদের চরিত্রগঠনের সহায়তা করে। ব্যায়ামে

শুধু শরীর গড়ে, কিন্তু এ শ্রেণীর খেলায় ছেলেদের মনে নীতির বীজ বুনে দেয়। এই শ্রেণীর খেলা হচ্ছে নব-বিদ্যালয়ের নীতিশিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা উপদেশ দিয়ে নীতিশিক্ষা দেওয়ায় মোটেই বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন, বহুকালের অভিজ্ঞতার ফলে একথা তাঁরা জোর করে বল্‌তে পারেন যে, নীতির উপদেশ দেওটা যে স্বধু ব্যর্থ তাই নয়, ছেলেদের পক্ষে তা বিশেষ ক্ষতিকর। ওতে যে স্বধু একটা নতুন দুর্নীতির শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং তার নাম হচ্ছে "নৈতিক জ্যাঠামি।" এঁদের মতে নৈতিক জীবনের মূলে আছে Collective sense, অর্থাৎ—সেই জ্ঞান, যার ফলে প্রতি লোক নিজেকে সমাজদেহের একটি অঙ্গ বলে মনে করে। এবং যে উপায়ে এই জ্ঞান, এই অনুভূতি বাড়ানো যেতে পারে, সেই উপায়ই হচ্ছে নৈতিক শিক্ষার যথার্থ উপায়;—বক্তৃতা নয়, নীতিপাঠ নয়, মারপিট নয়। এই সব খেলার ভিতর দিয়ে ছেলেরা নিয়মের মাহাত্ম্য বুঝতে শেখে, দশজনের সঙ্গে একাত্ম হতে শেখে, কার্য্য উদ্ধারে জন্য স্বেচ্ছায় স্বার্থপরতা ত্যাগ কর্‌তে শেখে। অতএব ফুটবল প্রভৃতি খেলা সকল ছেলেরই শুধু দেহের নয়, আত্মার উন্নতি লাভের জন্য খেলা কর্ত্তব্য। আইন মুখস্থ করতে নয়, স্বেচ্ছায় মানতে শেখবার সূত্রপাত ঐ খেলার মাঠেই হয়।

(১০)

খেলার পর আসে দৌড়ঝাঁপ—ইংরাজিতে যাকে বলে sports। খেলার সঙ্গে এর প্রভেদ এই যে, শরীরের এক একটি বিশেষ ক্রিয়ার এই উপায়ে অনুশীলন করা হয়। দৌড়নো লাফানো সকল খেলারই অঙ্গ, কিন্তু কি দৌড় কি লাফ কোনও খেলারই একমাত্র অথবা মুখ্য কর্ম্ম নয়। খেলাতে দেহের সকল শক্তির একত্রে প্রয়োগ দরকার। কিন্তু sports-এর উদ্দেশ্য, দৌড়বার শক্তি লাফাবার শক্তি প্রভৃতিকে আলাদা করে নিয়ে, সেই শক্তিকে বিশেষ করে বাড়িয়ে তোলা। এতে শরীরের যে শুধু এক একটা বিশেষ ক্ষমতা বেড়ে ওঠে তাই নয়, এতে ছেলেদের সাহসও বাড়ে। এর শিক্ষা হচ্ছে

দেহের শক্তির সীমা উত্তরোত্তর অতিক্রম করবার শিক্ষা। সুতরাং এ শিক্ষার ভিতর পদে পদে বিপদ আছে। এই বিপদকে উপেক্ষা করতে শেখবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের সাহস আপনাহতেই বেড়ে যায়। সুতরাং sports ছেলেদের শরীর মন দুই একসঙ্গে গড়ে তোলে। নব-বিদ্যালয়ে চৌদ্দ বছরের নীচে ছেলেদের sports শিখতে দেওয়া হয় না। এ কথাটা আমাদের মনে রাখা উচিত, কেননা শিক্ষা বিষয়ে আমাদের আর ত্বর সয় না—সে শিক্ষা শরীরেরই হোক্ আর মনেরই হোক্।

(১১)

সব শেষে আসে ব্যায়াম শিক্ষা। এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে স্বতন্ত্রভাবে বলিষ্ঠ করা,এবং সেই সঙ্গে সমগ্র দেহটাকে শক্তিশালী করা। একালের ব্যায়াম হচ্ছে পূরোমাত্রায় বৈজ্ঞানিক, অর্থাৎ—তা দেহের বিশেষ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেকালের ব্যায়াম অনেক স্থলে মারাত্মক হত—কেননা কোনও একটা বিশেষ অঙ্গের মাংস বাড়াতে এবং পেশি ফোলাতে গিয়ে, অনেক স্থলে সমস্ত দেহটাকে একেবারে জখম করে ফেলা হত। অবৈজ্ঞানিক ব্যায়ামচর্চ্চার ফলে, অনেকে লাভের মধ্যে হৃদ্‌রোগ শ্বাসরোগ প্রভৃতি অর্জ্জন করতেন। সমুদয়ের সঙ্গে অবয়বের যোগ যে কতকটা ঘনিষ্ঠ, এবং সে যোগসূত্র যে প্রাণ—এই জ্ঞানের অভাববশতই পালোয়ানেরা হয় স্বল্পায়ু, আর বাজিকরেরা পঙ্গু। Horizontal Bar-য়ে পাক খেয়ে খেয়ে শরীর যে দড়ি পাকিয়ে যায়, আর Parallel Bar-য়ে পালায় পালায় "ফড়িং" ও "ময়ূর"-বৃত্তির সাধনা করে, তীরের মত শরীর যে ধনুকের মত হয়ে যায়, এ আমার চোখে দেখা। বৈজ্ঞানিক ব্যায়ামের চর্চ্চায় অষ্টাবক্র হবার কোনই সম্ভাবনা নেই। এ ব্যায়ামের প্রকরণপদ্ধতি সব Ling Muller এবং Hebert-এর বইয়ে দেখতে পাবেন। সংক্ষেপে, যে ব্যায়ামকে Swedish Drill বলা হয়—সে হচ্ছে Ling-এর আবিষ্কৃত পদ্ধতি। Muller এবং Hdert তারই সংশোধিত সংস্করণ বার করেছেন। এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ

অনভিজ্ঞ—সুতরাং এ ক্ষেত্রে বেশী বাক্যব্যয় করা আমার পক্ষে অমার্জ্জনীয় অনধিকারচর্চ্চা। তবে এই ব্যায়াম শিক্ষা দেবার পদ্ধতি সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা আবশ্যক। নব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের মতে, এর শিক্ষক হওয়া উচিত ডাক্তার। প্রথমত, এতে প্রাণায়াম আছে; আর গুরুর অসাক্ষাতে প্রাণায়াম করলে যে মুখে রক্ত ওঠে, তার প্রমাণ, আমার জানত অনেক ভদ্রসন্তান যোগ অভ্যাস করতে গিয়ে পেয়েছেন। দ্বিতীয়ত, এর ক্রিয়াগুলি নিতান্ত নীরস, কেননা এ খেলা নয়—পুরোদস্তুর শিক্ষা। নীরস বলে এ ব্যায়াম বিরক্তিকর হবার সম্ভাবনা, সুতরাং শিক্ষকের পক্ষে এর প্রতি-ক্রিয়ার সার্থকতা আগে থাকতে ছেলেদের বুঝিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য। হাত-পা পাগলের মত উল্টো-পাল্টাভাবে কেন নাড়ছি, তার অর্থ বুঝলে সে হাত পা মানুষে মনের খুসিতে নাড়ে। ব্যায়ামটা পুরোপুরি শরীরের শিক্ষা হলেও—ঐ সঙ্গে শরীর-বিজ্ঞানেরও মোটামুটি কথা নব-বিদ্যালয়ের ছেলেরা শেখে। অধ্যাপক ফারিয়ার মতে খেলাধূলো, দৌড়ঝাঁপ, ব্যায়াম, প্রাণায়াম সবই খালি গায়ে করা কর্ত্তব্য। এর সার্থকতা যে কি, তা আমি বলতে পারিনে, ডাক্তারে বলতে পারেন। তবে এ গরম দেশে দেহমুক্ত করলে আমরা যে মুক্তিলাভ করি, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

(১২)

ছেলেদের হাতের কাজ শেখানো যে শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ, এই হচ্ছে একালের শিক্ষা-বৈজ্ঞানিকদের একটা পাকা মত। নব-বিদ্যালয়ে ছেলেদের মূর্ত্তি গড়তে, নক্সা আঁকতে, বই বাঁধতে, বেত বুনতে, কামার কুমোর ও ছুতোরের কাজ করতে শেখানো হয়। অধ্যাপক ফারিয়া বলেন, এ শিক্ষার উদ্দেশ্য ছেলেদের কামার কুমোর ছুতোর প্রভৃতি বানানো নয়। তাঁর মতে এ সব শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহকে সক্ষম ও সক্রিয় করা। কর্ম্মের প্রবৃত্তি ছোট ছেলের দেহ ও মনে অতিমাত্রায় থাকে। তারা একটা কিছু না করে, দু'দণ্ড স্থির থাকতে পারে না। এই কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে সুপথে চালানো

শিক্ষকের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। এ সব কাজে হাত দিয়ে ছেলেরা যে শুধু আনন্দ পায় তাই নয়, সেই সঙ্গে তারা যে হস্তকৌশল লাভ করে, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তার যথেষ্ট প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে। দ্বিতীয়তঃ, এই সব কাজের চর্চ্চায় তাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ চর্চ্চা হয়। এর ফলে তাদের নিরীক্ষণ করবার শক্তি, তুলনা করবার শক্তি, কল্পনা শক্তি, গড়বার শক্তি, রূপজ্ঞান, আকারের জ্ঞান, পরিণামের জ্ঞান, মাত্রার জ্ঞান, সংখ্যার জ্ঞান, পরিপুষ্ট হয়ে উঠে।

অধ্যাপক ফারিয়া বলেন যে, শিশুদের অবশ্য ও সব কাজ শেখানো যায় না, সুতরাং তাদের কাদা দিয়ে আল বাঁধতে, ঘর তৈরি করতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য। সে ঘর তারা ক্রমান্বয়ে ভাঙ্গবে ও গড়্বে — কেননা শিশুমাত্রেই অব্যবস্থিতচিত্ত। এ চিত্তকে ব্যবস্থিত করবার চেষ্টা যেমন ব্যর্থ, তেমনি ক্ষতি-কর, কেননা এই সব বিরোধী মনোভাবের সংঘর্ষেই তাদের আত্মার প্রদীপ জলে ওঠে। যাঁরা ছোট-ছেলেদের এই ধুলোমাটির সংস্রব হতে আলগোছ করে, ভদ্রলোক করতে চান, অধ্যাপক ফারিয়া তাঁদের একটা সত্য স্মরণ রাখ্তে বলেন। সে হচ্ছে এই যে, এ পৃথিবীতে মাটি আর জল হচ্ছে ছোট-ছেলের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। সুতরাং তাদের জল না ছুঁতে দিলে, ধুলো না নাড়্তে দিলে, ও দুয়ে মিলিয়ে কাদা না করতে দিলে, প্রিয়বস্তুর বিরহে তারা শরীর-মনে শুকিয়ে যায়। এ স্থলে বয়স্ক লোকদের জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে, এ পৃথিবীতে মাটি ও জলের চাইতে মহামূল্য বস্তু আর কি আছে ? মানুষের সকল কর্ম্মের মূল উপাদান হচ্ছে ক্ষিতি আর অপ্, সুতরাং শিশুরা এ পৃথিবীতে এসে প্রথমে তারই পরিচয় লাভ করতে ব্রতী হয়। ঐখান থেকেই তাদের জীবনব্রত- উদযাপনের সুরু হয়।

(১৩)

নব-বিদ্যালয়ের ছেলেদের কৃষিকর্ম্মও শেখানো হয়। মানুষের আদিম কর্ম্মক্ষেত্র, কৃষকের ক্ষেত্র,—শিল্প-জীবির কারখানা নয়। সুতরাং ছেলেদের কর্ম্মক্ষমতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করতে হলে, তাদের অল্প-বিস্তর কৃষিকর্ম্ম শেখানো ও

দরকার। লাঙ্গল চষলে কোদাল পাড়লে শরীর যে বলিষ্ঠ হয়, সে কথা বলা বাহুল্য; সুতরাং এ অধ্যবসায়ে মন ও চরিত্রের কি উপকার হয়, সংক্ষেপে তারই উল্লেখ করছি।

কারখানায় আমরা জড়-পদার্থ নিয়ে কারবার করি, কিন্তু মাঠে আমাদের সজীব পদার্থের সঙ্গে কারবার কর্‌তে হয়। বীজ বোনা থেকে ধান পাকা পর্য্যন্ত আগাগোড়া একটা জীবনের অভিনয় চলে। জীব-তত্ত্বের প্রথম অধ্যায় মানুষে ঐ শস্য-ক্ষেত্রেই পাঠ কর্‌তে পারে। এই সূত্রে আমরা যে জীবনের ক্রমবিকাশের জ্ঞানলাভ করি, শুধু তাই নয়,—সেই সঙ্গে সে জীবন যে আমরা রক্ষা কর্‌তে পারি, সংশোধিত কর্‌তে পারি, পরিবর্দ্ধিত কর্‌তে পারি, সে জ্ঞানও লাভ করি; এক কথায় এই সূত্রে আমরা আত্মজ্ঞানও লাভ করি।

তার পর মাঠে কাজ করবার দরুণ, ছেলেরা নানা গাছপালা ফুল ফল কীট পতঙ্গ জীবজন্তুর সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করে। শুধু তাদের আকৃতি নয়, তাদের প্রকৃতিরও পরিচয় পায়। এই উপায়ে তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার দিনের পর দিন পূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই জ্ঞানের ভিত্তির উপরেই তাদের কেতাবি বিজ্ঞানের শিক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। গাছপালা জীবজন্তুর সঙ্গে যে ছেলের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে—বটানি, জুওলজির কথা তার কাছে আর শুধু বইয়ের কথা নয়—জীবনের কথা।

কৃষি-কর্ম্মের আর একটি মহৎ ফল এই যে, ছেলেরা হাতেকলমে ও-কাজ কর্‌লে বড় বয়সে কৃষি-জীবিদের প্রতি আর অবজ্ঞা করে না। অলস ভদ্র-সন্তানেরা নিম্ন-শ্রেণীর লোকদের যে অবজ্ঞার চোখে দেখে, তার প্রধান কারণ যে, কৃষিকার্য্যের ভিতর যে কি মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব আছে, সে বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যে ছেলে ও-কাজ নিজে হাতে কর্‌তে চেষ্টা করেছে, সে ছেলে চির-জীবন কৃষি-জীবিদের মনে মনে শ্রদ্ধা কর্‌বে। সামাজিক হিসেবে এও একটা কম লাভ নয়। আজ এই পর্য্যন্ত। বারান্তরে শরীর ছেড়ে মনের শিক্ষার নবপদ্ধতির বিষয় আলোচনা করা যাবে।

আষাঢ় ১৩২৫

নব-বিদ্যালয়।

(ভাষা-শিক্ষা)

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণেষু

আমরা যখন বাঙলা ভাষাকে স্কুল কলেজের ভাষা করে তোল্‌বার প্রস্তাব করি, তখন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একদল লোক, আমাদের উপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁদের বিশ্বাস বাঙলা, বিদ্যাশিক্ষার ভাষা হলে আমাদের ছেলেরা ইংরেজি শিখ্‌বে না। এর পাল্টা জবাব অবশ্য এই যে, তারা ইংরাজি না শিখ্‌তে পারে কিন্তু বিদ্যা শিখ্‌বে। কিন্তু এ জবাবে কারও মন ভিজ্‌বে না। আমাদের দেশের কর্ত্তাব্যক্তিরা এর উত্তরে সমস্বরে বলবেন যে, সে বিদ্যে নিয়ে কি হবে—যার সাহায্যে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় না। ইংরাজি না জান্‌লে যে ভদ্রসন্তানের 'দিন আনা দিন খাওয়া' চলে না, এ কথা আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকেও জানে। ও ভাষায় অজ্ঞ হলে যে আমাদের ওকালতি, ডাক্তারি, কেরাণীগিরি, মাষ্টারি, এমন কি রাজ-নীতির নেতাগিরি করাও বন্ধ হবে—এ কথা বলাই বাহুল্য। এবং এসব ক্রিয়া বন্ধ হলে বাঙালীর জীবনে আর কি কাজ থাক্‌বে? ও অবস্থায় আমরা যে ঘরে বসে সাহিত্য রচনা করব তারও সম্ভাবনা কম। যা কথায় কথায় ইংরাজির তরজামা নয়, তা যে বাঙ্‌লা সাহিত্য, অন্ততঃ সাধু-বাঙলা সাহিত্য হতে পারে না, তার প্রমাণ শতকরা নিরনব্বই জন বাঙালা গদ্য লেখকের লেখায় অর্থাৎ আমাদের সকলের লেখায় নিত্যই পাওয়া যায়। অতএব ইংরাজি না শিখ্‌লে যে বাঙ্‌লার সর্ব্বনাশ হবে, এ বিষয়ে দ্বিমত নেই—এবং থাক্‌তে পারে না। তবে বাঙ্‌লা না শেখাটা ইংরাজি শিক্ষার সদুপায় কি না সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির প্রসাদে দেশের লোক যে ইংরাজি শিখ্ছে—ইরাজি-নবিশদের এই ধারণাটি অনেকটা অমূলক। পাঁচ বৎসর বয়েস থেকে স্বরু করে পঁচিশ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত দিনের পর দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে'—আমাদের বিদ্যার্থীরা 'যে, ইংরাজি ভাষার উপর কতটা অধিকার লাভ করে, তার পরিচয় যিনি কখন B. L. পরীক্ষার কাগজ পরীক্ষা করেছেন, তিনিই পেয়েছেন। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে যাঁদের হাতে উকিলের সনন্দ দিয়ে বিদায় করা হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন সাধু-ইংরাজি লেখা দূরে থাক শুদ্ধ ইংরাজিও লেখেন না, শতকরা পঁচিশজন লেখেন বাবু-ইংলিশ, আর শতকরা দশজন যা লেখেন, তা দিনেমার ওলন্দাজ কিম্বা আলেমানের ভাষা হতে পারে—কিন্তু ইংরাজের নয়; অথচ এঁরা সকলেই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। এত দীর্ঘকালব্যাপী ইংরাজি ভাষার এই একাগ্র চর্চ্চা এতটা বিফল হয় কেন? বাঙালী জাতি সরস্বতীর কৃপায় বঞ্চিত নয়, তবে আমাদের যুবকদের মধ্যে শিক্ষার এই ব্যর্থতার কারণ কি?—কারণ এই যে, পাঁচ বৎসর বয়সে ছেলেরা ইংরাজি ধরে এবং পঁচিশ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত তারা দিবারাত্র এক ঐ ইংরাজিরই চর্চ্চা করে।

সকল শিক্ষার মত, বিদেশীভাষা শিক্ষাও কাল ও পাত্র সাপেক্ষ। শৈশব এ শিক্ষার উপযুক্ত কাল নয়, বালক এ শিক্ষার উপযুক্ত পাত্র নয়। শিশুর দেহের পক্ষে মাতৃদুগ্ধ যা, বালকের মনের পক্ষে মাতৃভাষাও তাই। অর্থাৎ মাতৃভাষার সাহায্য বিনা বালকের মন গড়ে ওঠে না। ছেলেরা যে ভাষা অষ্টপ্রহর শোনে, আর যে ভাষায় অষ্টপ্রহর কথা কয়, সেই ভাষার সাহায্যেই তারা পরের কথা বুঝতে ও নিজের কথা বোঝাতে শেখে। ছেলের মন ও ছেলের ভাষা, ও দুই হচ্ছে একই জিনিসের এ-পিঠ আর ও-পিঠ; স্থতরাং এ দুই এক সঙ্গে যেমন বেড়ে ওঠে তেমনি গড়ে ওঠে। তারপর আত্মপ্রকাশ করবার চেষ্টাতেই মানব-সন্তানের ভাষার উপর যথার্থ অধিকার জন্মে এবং সেই সঙ্গে মনের শক্তিও বৃদ্ধি পায়। শিশুর দেহের সঙ্গে তার মন এবং তার

মনের সঙ্গে তার স্বভাষা-জ্ঞান যে এক রকম স্বাভাবিক নিয়মে গড়ে ওঠে, এ কথা বললেও অত্যুক্তি হয় না। অপরপক্ষে বিদেশী ভাষা, সজ্ঞানে শিখতে হয়; সুতরাং তা শেখ্‌বার জন্য সেই মন চাই—যে-মন বালকের নেই। বারো বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিদেশী ভাষা শেখ্‌বার চেষ্টাটা ছেলেদের পক্ষে যে, শুধু কষ্টকর ও ব্যর্থ, তাই নয়—তার মনের পক্ষেও যথেষ্ট ক্ষতিকর। মদ্য মাংস সেবন ছোট ছেলের দেহের পক্ষে যতটা উপকারী, একটি বিদেশী ভাষার চর্চ্চা ছোট ছেলের মনের পক্ষে তার চাইতে বেশি উপকারী নয়। আমরা ছোট ছেলেদের তা গিলিয়ে দিতে পারি কিন্তু তা জীর্ণ করবার শক্তি তাদের নেই। ফলে অল্প বয়েসে ইংরাজি শিখ্‌তে গিয়ে, আমাদের ছেলেরা ইংরাজিও ভাল করে আয়ত্ত করতে পারে না এবং লাভের মধ্যে শুধু মানসিক মন্দাগ্নি-গ্রস্ত হয়ে পড়ে। যে মন ছেলেবেলায় বিদেশী ভাষার চাপে জড় হয়ে পড়ে, সে মন কৈশোর ও যৌবনে তার পূর্ণশক্তি লাভ করতে পারে না। আমাদের অধিকাংশ যুবকদের মনের যে দম ও কশ নেই, তার একমাত্র কারণ আমাদের এই সৃষ্টিছাড়া শিক্ষা-পদ্ধতি। কিন্তু ইংরাজি শেখাটা আমাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার জন্য এতই প্রয়োজন, যে আমাদের সমাজের যত বিদ্বান্‌ ও বুদ্ধিমান লোক একবাক্যে বল্‌বেন,—হোক আমাদের ছেলেরা মনে পঙ্গু, তাদের ঐ পাঁচ বছর বয়স থেকেই **A. B. C.** শিখ্‌তে হবে, নচেৎ তারা বয়েসকালে ইংরাজি-নবিশ হতে পারবে না। না ভেবেচিন্তে কথা কওয়াটা, বিশেষত সেই সব বিষয়ে—যে বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ—আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা রোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কেননা অপর দেশের শিক্ষার প্রণালী এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে এঁরা যদি কিছু খোঁজ খবর রাখতেন, তাহ'লে এঁরা এ কথা জানতেন যে, বারো বৎসর বয়েসের পরে, অর্থাৎ মাতৃভাষার উপর যথেষ্ট পরিমাণে অধিকার লাভ করবার পরে, ছেলেরা দু-তিন বৎসরে বিদেশী ভাষা যতটা আয়ত্ত করতে পারে, পাঁচ বৎসর বয়েস থেকে সুরু করে তারপর দশ বৎসরের অবিরাম

চর্চ্চায় তার সিকির সিকিও পারে না। এই কারণে নব-বিদ্যালয়ে ছেলেদের বারো বৎসর বয়েসের আগে মাতৃভাষা ছাড়া আর কোনও ভাষার সংস্রবে আসতে দেওয়া হয় না। এদেশেও পুরাকালে উপনয়নের পরই সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

অতএব ভাষা শিক্ষার প্রথম এবং প্রধান কথা হচ্ছে—মাতৃভাষা শিক্ষা। মাতৃভাষাও যে একটা শিক্ষার বিষয়, এ জ্ঞান আমরা হারিয়ে বসে আছি। আমাদের ধারণা, এ বিষয়ে বাঙালীমাত্রেরই অশিক্ষিত পটুত্ব আছে। সে পটুত্ব যে বেশির ভাগ লোকের নেই, তা তাঁরা বাঙলা লিখ্‌তে বস্‌লে অবিলম্বে আবিষ্কার কর্‌তে পার্‌বেন। সাহিত্যে আমাদের তুল্য মুখচোরা জাত যে অপর কোনও সভ্যদেশে নেই, তার কারণ আমাদের শিক্ষার গুণে আমরা আশৈশব আত্মপ্রকাশ কর্‌বার সুযোগ পাই নি। স্কুলের ছেলের পক্ষে স্বচ্ছন্দে ইংরাজিতে আত্মপ্রকাশ করা অসম্ভব এবং বাঙলাতে করা বারণ। এর ফলে আমাদের অধিকাংশ লোকের ভাষাজ্ঞান ছোট ছেলের জ্ঞানেরই সমতুল্য, খাওয়া-পরা চলা-ফেরার জন্য যতখানি ভাষাজ্ঞান থাকা প্রয়োজন, অর্থাৎ কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য যে ক'টি কথা না জান্‌লে নয়, আজকের দিনে অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালী সেই ক'টি নিত্য ব্যবহার্য্য কথাই অক্লেশে ব্যবহার কর্‌তে পারেন। আমাদের অন্তরে মাতৃভাষার ভিৎ আছে কিন্তু সে ভিৎ এত কাঁচা যে, তাঁর উপর কি দেশী কি বিলেতী কোনও ভাষার পাকা ইমারৎ খাড়া করা যায় না। অতএব মাতৃভাষা যদি আমরা শিক্ষা করি, তাতে করে ইংরাজি-শিক্ষার কোনও ক্ষতি হবে না; উপরন্তু, আমাদের মন সবল, সুস্থ এবং স-ক্রিয় হয়ে উঠ্‌বে। তখন আমাদের আর, এ বলে দুঃখ কর্‌তে হবে না যে, দেশে এত বিদ্যে আছে অথচ তা দেশের কোনও কাজে লাগে না। পৃথিবীর দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্যের সকল বিদ্যা যে আমাদের মনের চক্রব্যূহে ঢুক্‌তে পারে কিন্তু বেরুতে পারে না, তার কারণ আত্মপ্রকাশের সহজ পথটিই আমরা বাল্যকালেই ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য হয়েছি।

মাতৃভাষাও শিক্ষা কর্‌বার জিনিষ, কিন্তু তাই বলে যে উপায়ে যে পদ্ধতিতে আমরা একটি বিদেশী অথবা একটি মাতৃভাষা শিক্ষা করি সে উপায় সে পদ্ধতি, মাতৃভাষা শিক্ষার পক্ষেও আবশ্যকও নয়—উপযোগীও নয়। বিদ্যারম্ভেই অমরকোষ ও মুগ্ধবোধ কণ্ঠস্থ করাই হয়ত সংস্কৃত শেখার সহজ উপায়, কিন্তু ব্যাকরণ অভিধানের সাহায্যে কাউকেও মাতৃভাষা শিখ্‌তে হয় না; সুতরাং ও উপায় অবলম্বন কর্‌তে শিশুদেরও বাধ্য করা অসঙ্গত। যে উপায়ে ছেলেরা ভাষা নিজে শেখে, সেই উপায় অবলম্বন করেই তাদের ভাষা শিক্ষা দিতে হবে, অতএব এ শিক্ষার গোড়ায় ব্যাকরণ অভিধানের কোনও স্থান নেই। বিদেশী ভাষা শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ হচ্ছে, বিদেশী শব্দের স্বদেশী প্রতিশব্দ শেখা। কিন্তু মাতৃভাষার গোড়াকার শিক্ষা হচ্ছে—বস্তুর সঙ্গে তার নামের, বাচ্যের সঙ্গে তার বাচকের সম্বন্ধের জ্ঞান লাভ করা। ছেলেরা গ্রন্থ কিম্বা গুরুর সাহায্য না নিয়ে, আপনা হতেই যে-সব কথা শেখে সেই শব্দ-সংগ্রহই হচ্ছে সব ভাষারই মূল উপাদান, এই উপাদান করায়ত্ত না কর্‌তে পার্‌লে, ভাষার উপর পূর্ণ অধিকার জন্মে না, এবং একটি বিদেশী ভাষা শেখার মুস্কিলই এই যে, সে ভাষার মূল উপাদানের পুঁজি নিয়ে আমরা তার বিস্তৃত জ্ঞান লাভ কর্‌তে বসি নে। সুতরাং মাতৃভাষার শিক্ষা লেখাপড়া দিয়ে সুরু কর্‌বার দরকার নেই, অর্থাৎ হাতে খড়ি দেওয়াটা বিদ্যারম্ভের প্রথম ক্রিয়া নয়। নব-বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষা-পদ্ধতির বিস্তারিত পরিচয় বারান্তরে দেব।